শ্রমজীবীরাই সমাজের স্তম্ভ

—ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী

প্র(ঃ আপনার 'কড়া চাবুক' পড়ে আপনি যে বেদ-ভিত্তিক সাম্যবাদের কথা বলতে চাচ্ছেন, তা বুঝলাম। আমাদের বি(্বাস, আজকে দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে এইরকম একটি উদার মতবাদেরই প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। কিন্তু শুধু মুখে মুখে বা কাগজে কলমে তো তাকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না! দেশে এই ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, এবং এই নীতির উপর সমাজ গড়ে তুলতে হলে রাজনীতির (ে ত্রে সত্রি(য় অংশ গ্রহণ করতেই হবে। 'সন্তান দল' তো রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছে না। সেইজন্য আমরা বেদের মত ও পথ অনুযায়ী C.P.I.(V) নাম দিয়ে একটা দল বা Party গঠন করতে চাচ্ছি—যারা রাজনীতিতে সত্রি(য় অংশ গ্রহণ করবে এবং রাজনীতির মাধ্যমে দেশে আপনার বেদভিত্তিক সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ C. P. I. (V)-টা কি?

প্র(ঃ কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (বেদিষ্ট)।

উত্তর ঃ চোদ্দদল, চোদ্দশত দল হলেও (তি নেই। আগেইতো বলেছি—খণ্ডমেঘ খণ্ড খণ্ড হতে হতেই মিলিয়ে যায়। সুতরাং নতুন দলই কর, আর যা আছে তার রদবদলই কর, একটা কথা সব সময় মনে রাখবে—নীতি যেন সব সময় ঠিক থাকে। উদ্দেশ্যটা যেন সব সময় পরিষ্কার থাকে। আজ এক কথা বললাম, কাল আর এক কথা বললাম—আজকের দিনে যা হচ্ছে, তা করলে চলবে না। বেদকে যদি তোমরা আশ্রয় করতে চাও, তাকে অবলম্বন করে যদি নিজেদের কর্মপদ্ধতি স্থির করতে চাও, তবে বেদ কি—তার দর্শন কি—সে কি বলতে চায় সেটা আগে ভাল করে বুঝে নাও। আমাদের দেশে আজ এক একটি সম্প্রদায় বেদের এক একটি শব্দ বা সূত্রের এক একটি অংশকে ধরে এমন এক একটি চরম মত দিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে সাধারণ লোকেরা কোন্‌টা গ্রহণ করবে ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই বেদ থেকেই তাদের যুক্তি(, চিন্তা এবং দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে। প্রত্যেকেই বলছে "আমি বেদকে অবলম্বন করেই এই কথা বলছি, সুতরাং আমার মতই সত্য।" কিন্তু সবার কথাই আংশিক সত্য (কারণ কেউই বেদের নির্যাসটুকু ধরতে পারেনি। বেদের মূল বক্তব্য ধরতে না পেরে, হয় তারা পুরোপুরি আস্তিক্যবাদী হয়ে উঠছে, না হয় পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে উঠছে। কোনটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়।

'আছে' বা 'নাই' যে যাই বলুক, সে তার কল্পনা থেকে একটা ধারণা করেই তো বলছে। বেদ থেকে তারা তাদের মতের সমর্থনে কিছু কিছু শব্দ তুলে ধরছে, কিন্তু প্রত্য(প্রমাণ দেখাতে পারছে না। বেদ হচ্ছে জ্ঞান—এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তার কোনটাই কল্পনা বা ধারণাপ্রসূত নয়। সমস্ত কিছু যুক্তি(নির্ভর এবং বিজ্ঞানসম্মত। বেদ হচ্ছে দর্পণ স্বরূপ। প্রকৃতির সমস্ত কিছুর প্রতিবিম্ব এতে ধরা পড়েছে। সুতরাং প্রকৃতির যে নীতি, বেদেরও সেই নীতি। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীবের যে ধর্ম, বেদেরও সেই ধর্ম। 'বেদ' সম্বন্ধে অনেকের এলার্জী আছে। বেদ বললেই তাদের মনে হয় এটা একটা কাল্পনিক তত্ত্বকথার সঙ্কলন—একটা রহস্যময় আধ্যাত্মিক বাদ-এর ধারণা তাদের মনে জাগে। এ ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বেদের বাণী, বেদের তত্ত্ব, বেদের দর্শন সম্পূর্ণভাবে বাস্তবভিত্তিক। বেদ কোথাও কল্পনার কথা, অজানার কথা বলেনি। ভগবান 'আছে' বা 'নাই'—এর কোন কথাই বেদ বলেনি। 'ভগবান' শব্দটিই আদি বেদে নেই ('দেবতা' কথাটি আছে। দেবতা সম্বন্ধে বেদ বলছে—প্রকৃতির যে যে বস্তুর কাছ থেকে আমরা উপকৃত হচ্ছি, সেইগুলিই হচ্ছে দেবতা (সেই সেই বস্তুগুলির যত্ন নেওয়া হোক, সেগুলিকে র(া করা হোক, সেগুলিকে কাজে লাগান হোক। বেদ বলছে—প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে বি(-ষণ করতে করতে এগিয়ে যাও। আগেই কোন চরম সিদ্ধান্ত দিয়ে বসবে না। দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হও। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাই দিয়ে শু(কর। যা চোখে দেখছ, কানে শুনছ, সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করছ, সেগুলিকে সত্য ধরে নিয়ে বি(-ষণ করতে করতে দেখ, শেষ পর্যন্ত কোথায় উপনীত হও। তারপর তোমার সিদ্ধান্ত দাও। তার আগে পর্যন্ত কোন চরম সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার তোমার নেই। যুক্তি(, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ছাড়া তুমি বলতে পারবে না "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য"। আবার যুক্তি(, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ছাড়া তুমি বলতে পারবে না "এই জগৎই সব—তার বাইরে আর কিছু নেই।" কোন কিছু সংকেত ধরে তোমার মনে যদি কখনও 'আছে' বা 'নাই' এর চিন্তা জেগে ওঠে, তখন সেই চিন্তার সূত্র ধরে তুমি তোমার বি(-ষণের কাজ আরম্ভ করতে পার। আপন মনে তুমি তোমার কাজ করে যাও। কিন্তু সেই ধারণা দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করার চেষ্টা তুমি কখনও করবে না। তুমি তোমার বি(-ষণের পথে এগিয়ে যাও। রিসার্চ করতে করতে দেখ, তুমি কোন্ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাচ্ছ। সে সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমার নিজের যখন কোন সংশয় থাকবে না, তখন তোমার কাজের গতি ও পরিণতির বৃত্তান্ত, তোমার যুক্তি(ও দৃষ্টান্ত, তোমার প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত তুমি সমাজের কাছে পৌঁছে দাও। দেখবে সমাজ তা সাগ্রহে, দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করবে। তার আগে পর্যন্ত 'আছে' বলারও দরকার নেই ('নাই' বলারও দরকার নেই। বেদের এই নীতি ও দর্শনকে যদি খুব ভালভাবে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী নিজেদের কর্মপদ্ধতি ঠিক করে নিতে পার, তবে দেখবে সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।

আজকের ভারতবর্ষ এই দুই চরমপন্থীদের মাঝে পড়ে বেদের প্রকৃত নীতি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আর বেদ থেকে 'আস্তিক্যবাদ' ও 'নাস্তিক্যবাদ' নামে যে দুটো ধারা বেরিয়ে এসেছে, সেই উভয় দলেরই বেশ কিছুসংখ্যক 'এই জগৎই সত্য' এবং 'এর পরেও কিছু আছে কিনা দেখ'—বেদের এই কথা দুটির সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে

চলেছে, এবং অনেক সমাজবিরোধী কাজ করে চলেছে। তোমরা যদি কোন সংগঠন গড়ে তোল, তবে এদুটোকেই সমূহ বন্ধ করে কাজ করবে।

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছি। আস্তিক্যবাদীরা বলছেন—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বি(েষণ করলে, এর নিয়ম-শৃঙ্খলা-সমতা ল(্য করলে মনে হয় এর পেছনে একটি শক্তি(যেন একে পরিচালিত করছে। সুতরাং তাঁদের চিন্তাধারা বস্তুজগৎকে ছাড়িয়ে গেল। সেখান থেকেই তাঁরা তাঁদের বি(েষণের কাজ শু(করলেন—কিভাবে সৃষ্টি হলো? কে আছে তার পেছনে? কি তার শক্তি(?—এই ভাবে রিসার্চ করে চলেছেন। চরম সিদ্ধান্ত কোথাও দেননি। স্বার্থান্বেষী এক দল তাদের এই বি(েষণের ধারাটিকে বিকৃত করে ভগবান, পরলোক, যাগ, যজ্ঞ—নিজেদের মনগড়া কতগুলো তত্ত্ব ও তথ্যকে বেদের নাম দিয়ে নিরীহ সহজ সরল-প্রাণ লোকদের মনে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কতগুলো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে চলেছে। আজ এই সব ধারণা তাদের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সেগুলি থেকে তাদের মুক্ত(করে সত্যকার বেদের তত্ত্ব তাদের বুঝিয়ে দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। এমনভাবে তাদের প্রভাবিত করা হয়েছে যে, তাদের বুঝের গণ্ডির বাইরে যেতে তারা আর পারছে না। ডানা তাদের ভারি হয়ে গেছে। তাদের সংস্কারের পিঞ্জর থেকে মুক্ত(করে আবার মুক্ত(আকাশে বিচরণ করতে শেখাতে হবে। তার জন্য অসীম ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। তোমাদের সংগঠন যেন এ কাজের দায়িত্বও গ্রহণ করে। এ কাজ কিন্তু বড় কঠিন কাজ। এতদিনকার সংস্কারে যখন নাড়া পড়বে, তখন তারাও বিদ্রোহ করতে পারে। কারণ বেদকে তারা বিশ্বাস করে এবং শ্রদ্ধা করে। তাদের বোঝান হয়েছে, বেদই বলছে—ধর্ম হচ্ছে পূজা, অর্চনা, যাগ, যজ্ঞ। পরলোক, জন্মান্তর—এগুলি হচ্ছে বেদ-এরই তত্ত্ব। যাতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ইহলোকে দুঃখ ভোগ করতে না হয়, মৃত্যুর পর যাতে অনন্ত স্বর্গবাস হয়, তার জন্য পূজা কর, হোম কর। এ ছাড়া ধর্ম আর কিছু নয়।—সরলপ্রাণ, নিরীহ ভারতবাসী এগুলিকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে, সেই ভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। আর স্বার্থান্বেষীদের ভুঁড়িও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে—এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে, সংস্কারের জাল থেকে মুক্ত(করে তাদের সত্যের সন্ধান দেওয়া। সব সময় মনে রাখবে—'ছাড় ছাড়' বললেই তারা কিছু ছেড়ে দেবে না, আবার 'ধর ধর' বললেই তারা নতুন কিছুকে আঁকড়ে ধরবে না। তোমাকে হতে হবে বি(েষণমুখী। ওরা যতটুকু জানে, যতটুকু বোঝে ততটুকুর মধ্যে থেকে বি(েষণ করে করে বুঝিয়ে দাও। তুমি যতটুকু জান, তার মধ্যেই তোমার চিন্তাধারা, যুক্তি(ঠিক রাখ। জানা জগতের বাইরে যাওয়ার এখন কোন প্রয়োজন নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটাই হচ্ছে তোমার সমূহ জানা জগৎ। এটুকুই এখন তোমার সীমা। এখন পর্যন্ত ঐটুকুই মেনে নিয়ে তোমার কর্মপদ্ধতির ধারা, আলাপ, আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবে। তোমরা প্রমাণে না আসা পর্যন্ত জন্মান্তর, পরলোক, ভগবান ইত্যাদি সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারণ করতে পারবে না। যতদিন পর্যন্ত না ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হও, এবং অপরকেও নিঃসন্দেহ করতে পার, ততদিন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন কিছু আলোচনা করারই প্রয়োজন নেই। ধর্ম বলতে এটুকুই বুঝবে—ন্যায় ও কর্তব্য।

আজ আমাদের দেশে বেশীর ভাগ লোকই ভগবানে বিশ্বাসী। কিন্তু একটা ঘরে অনেক টাকাকড়ি রেখে দুয়ারের সামনে একটি অজগর সাপ রেখে দাও, কেউ আর সেই ঘরের ত্রিসীমানায় আসবে না। অথচ যদি সেই ঘরে ডবল তালা ঝুলিয়ে বল—ভগবান সর্বত্র আছেন, এঘরেও তিনি বিরাজিত, এখানে তিনিই পাহারা দিচ্ছেন—ক'জন শুনবে সে কথা? পরদিনই দেখবে দরজার তালা ভাঙ্গা, ঘরে কিছুই নেই। অথচ তারা বলছে "ভগবানে বিশ্বাসী"। ভগবানের চেয়ে পুলিসের দোহাইকে ভয় পাচ্ছে বেশী। কেন এই দোমনা ভাব? কারণ তার অস্তিত্বকে প্রমাণে আনতে পারেনি। তাই সেখানে তারা সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করতে পারছে না, নির্ভর করতে পারছে না। যখনই নিশ্চিন্ত ভাবে এক জায়গায় মন স্থির করা যাচ্ছে না, তখনই আসছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। তার থেকেই সমস্যা, তার থেকেই জটিলতা। ভগবানকে যদি প্রমাণে এনে সকলেই সেখানে একই ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত, নির্ভর করতে পারত, তবে দেখতে—সমাজের রূপ, দেশের রূপ অন্য রকম হতো (এক অপূর্ব ধারায় চলে যেত। তাতো হচ্ছেই না, বরং আস্তিক্যবাদের সুযোগ নিয়ে একটা বৃহৎ গোষ্ঠি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও দেশ-জাতির সর্বনাশ করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে। এদের উপরই আমার আত্রে(াশ। আস্তিক্যবাদের উপর আমি কোন আত্র(মণ করছিনা। এই শোষক সম্প্রদায় জায়গায় জায়গায় আশ্রম, মঠ, মন্দির করে, বাবাজী, ব্রহ্মচারী, আনন্দ নামধারী হয়ে সমাজকে নিঃশেষে দোহন করে চলেছে। অনেক সহজ সরল ধর্মপ্রাণ নরনারী আছে, যারা ঐ শোষকগোষ্ঠীর প্রভাবে ভগবান, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। আমার কথায় হয়তো তারা আঘাত পাবে। তার জন্য আমারও দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তাদের আঘাত দেওয়া নয়, তাদের সাবধান করে দেওয়া। সমাজে যখন ভাঙ্গন ধরেছে, তখন তাদের এ আঘাত সহ্য করতেই হবে। টাইটানিক জাহাজে ভাল মন্দ সকল মানুষই উঠেছে।—জাহাজ ফুটো হয়ে গেল। তখন তো শুধু ভাল লোকদের বাদ দিয়ে মন্দ লোকদের নিয়েই জাহাজ তলিয়ে যাবে না! সকলকে নিয়েই তলাচ্ছে। তখন সকলকেই সাবধান করে দিতে হবে। সমাজের আজ সকল দিকে ছিদ্র হয়েছে। খাদ্য, অর্থ, শি(া, ধর্ম, বাস্তবজীবন, আধ্যাত্মিক জীবন—সকল দিকে জটিলতা, সকল দিকে সমস্যা। কোন দিকই সফল হতে পারছে না। এমন একটা দিক নেই যা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বলতে পারা যায়—হ্যাঁ, আমাদের এদিকটা উন্নত (একদিকে খালি হয়ে গেলেও আর এক দিক নিয়ে আমাদের দেশবাসী নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। কিন্তু তাতো নয়। তাদের কিছুই হয়নি। যেখানে ছিল, আজও সেখানেই আছে। শত সহস্র বছর ধরে এই সরলপ্রাণ নিরীহ ব্যক্তি(দের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। বেদজ্ঞরা বলছেন—এটা সমীচীন নয়। ভগবান যদি থেকে থাকে, খুব ভাল কথা। আমরা 'নাই' একথাও বলছি না। কিন্তু না জানা পর্যন্ত 'আছে'-ও বলব না। এটাই বেদের কথা। তাই বলছি—জন্ম ও মৃত্যুর মত যখন ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসে আসতে পারবে, তখনই সে সম্পর্কে চিন্তা ও কাজ শু(করবে, এবং অপরকে বলতে পারবে। তার আগে নয়। যেমন ধর, তোমার স্থির বিশ্বাস—খনন করলে জল মিলবেই। তখন তুমি যত কষ্ট

হোক, যত পরিশ্রম হোক, যত ফুট তলেই হোক, খনন করতে আরম্ভ করবে। খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় ঠিকই জলের সন্ধান পাবে। কিন্তু খালি জায়গায়, না জেনে, অন্ধকার হাৎড়ে তো কোন লাভ নেই! যদি বুঝতাম, ভগবান-বি(োসী হলে বা অদৃষ্টবাদী হলেই বাস্তবের সমস্যা আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না—চির-শান্তিতে সে থাকবে—তা হলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু তাও তো নয়। অশান্তির আগুনে তাদের বেশীর ভাগই জ্বলছে। নিজেরা পুড়ছে, সমাজকে পোড়াচ্ছে। ভগবান-বি(োসী, অদৃষ্টবাদী হয়ে সমাজ আজ শুধু মার খেয়েই চলেছে—ভাত আর খেতে পায় না। চোখের সামনে খাদ্য, অথচ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে তারা হয় না খেয়ে মরছে, না হয় রাস্তার আবর্জনা কুড়িয়ে খেয়ে অসুখে মরছে। এই তো পরিণতি! ভগবান-বি(োসী হয়ে আজ অধিকাংশই মে(দণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। কোন বিপ-বের বুদ্ধি নেই। (খে দাঁড়াবার শক্তি(নেই। তাদের বোঝান হয়েছে—পূজা-অর্চনা জপ-সাধনা কর, একদিন সব মিলবে। কিন্তু এত করেও যখন কিছু মিলছে না (তখন রেডিমেড উত্তর তো ঠিকই আছে—'জন্ম জন্মান্তরের পাপের ফল', কিম্বা 'কাম বর্জন করতে পারনি'। বলার আর কিছু নেই। আমাদের দেশের লোকেরা সেই কথাই মেনে নিয়ে আবার জন্মজন্মান্তরের পাপ খণ্ডন করার জন্য নতুন করে প্রায়শ্চিত্ত শু(ক'রল—দান, ধ্যান, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন শু(করল। এইভাবে সমাজ ত্র(মশঃই ভাঙ্গনের দিকে গড়িয়ে চলেছে।

বেদজ্ঞরা বলছেন—সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া যেমন অপরাধ, তার প্রতিবাদ না করাও তেমনি অপরাধ। আজকের মানুষ সেই অপরাধে অপরাধী। তোমাদের বর্তমান কাজ হচ্ছে—যে সব সম্প্রদায় আজ ধর্মের নামে, ভগবান বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে ব্যবসা আর জমিদারী ফেঁদে বসেছে, তাদের উচ্ছেদ করা। যাও সকল তথাকথিত সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে। তাদের বল—হয় উপযুক্ত(প্রমাণ দেখিয়ে তোমাদের মতে আমাদের টেনে নাও, না হয় তল্পি গোটাও। এতদিন slow poison করে সমাজে যে ভাঙ্গন ধরিয়েছ, এখন আর তা চলবে না। তোমাদের একচ্ছত্র জমিদারীগিরি সমূলে শেষ করে জমিতে গিয়ে নাম। লাঙ্গল ধর, চাষ কর। যতদিন পর্যন্ত ভগবান সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ না পাচ্ছ, ততদিন পর্যন্ত বাস্তবের পথই তোমাদের পথ। তোমরা তোমাদের সংগঠন নিয়ে গ্রামে গ্রামে চলে যাও। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে চলে যাও। সেখানে নিজেরা পরিশ্রম কর, খেটে খাও। বেদ বলছে—শ্রমই হচ্ছে সমাজের উন্নতির সোপান। শ্রমজীবীরাই সমাজের স্তম্ভ। তাই শ্রমিক হয়ে সবাই কাজ কর। ভগবানের দোহাই দিয়ে, অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে কেউ যেন বসে না থাকে। কেউ যেন কা(র মাথায় হাত বুলিয়ে না খায়। সাথে সাথে একটি কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—'ভগবান আছে' এ কথা যেমন বেদ বলছে না, 'ভগবান নেই'—এ কথাও বেদ বলছে না। তাই যারা আস্তিক্যবাদী, তাদের একজনও যদি তাদের সপ(এমন প্রমাণ দেখাতে পারে যা সর্বজনগ্রাহ্য, যে প্রমাণে কোন বিবাদ-বিতর্ক নেই, জন্ম মৃত্যুর মত যার সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকবে না, প্রতিটি ব্যক্তি(যা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারবে—তখন কিন্তু তোমরা তাদের মত গ্রহণ করতে মুহূর্তও দ্বিধা করবে না। সেদিন তোমাদের পথের ধারা পরিবর্তন করে নতুন দিকে চালিত করবে।

এত(ণ তোমাদের বেদের আস্তিক্যবাদীদের বি(-ষণের ধারা এবং তার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসার কথা বললাম। এখন বেদেরই আর একটি ধারার কথা বলছি। বেদের বস্তুতত্ত্বের দিকটি ধরে এক সম্প্রদায় চিন্তা করতে লাগলেন—এর বাইরে যখন আমরা প্রমাণে আনতে পারছিনা, তখন ওদিকটা নিয়ে চিন্তা করারই দরকার নেই। তাঁদের চিন্তা বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। এই বস্তুজগতেরই উন্নতি সাধন করার জন্য তাঁরা নানাভাবে রিসার্চ করে চললেন। এঁদের বলা হচ্ছে 'বস্তুবাদী'। আস্তিক্যবাদের সুযোগ নিয়ে যেমন একদল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে নিচ্ছে, বস্তুবাদের সুযোগ নিয়েও আবার ঠিক সেই রকম এক শ্রেণীর লোকেরা আর একদিক থেকে ব্যবসা শু(ক'রল। তারা প্রচার করতে লাগল—'ভগবান নেই, ধর্ম নেই, পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। এই জগৎটাই সব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যেন-তেন ভাবে জীবনটাকে উপভোগ করে নাও।' এই জীবনটাই যখন সব, পাপ-পুণ্য বলে যখন কিছু নেই, তখন তারা নির্ভাবনায় অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করার চেষ্টা করছে, আর সব অর্থ নিজেদের ব্যক্তি(গত কাজে লাগাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় গিয়ে হামলা করছে, গোলমাল বাধাচ্ছে। ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজে অশান্তি অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের কর্মপদ্ধতিতেও সমাজে কোন শান্তি শৃঙ্খলা আসছেনা। তার কারণই হচ্ছে, তারা তাদের মতের সপ(এমন কোন যুক্তি(বা প্রমাণ দেখাতে পারছে না, যা সর্বজনগ্রাহ্য। তারা যে 'নেই' বলছে—এটাও একটা ধারণা থেকেই বলছে। কোন রকম বি(-ষণের মধ্যে, যুক্তি(র মধ্যে বা প্রমাণের মধ্যে না গিয়েই তারা তাদের চরম সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে—'এই জগৎটাই সব।' সুতরাং এরাও সংস্কার থেকে মুক্ত(নয়। এরাও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। মনে রেখো, আমি কিন্তু বস্তুবাদ বা বস্তুবাদীদের আত্র(মণ করছি না। তাঁরা তাঁদের ধারণাকে ধরে বি(-ষণের পথে এগিয়ে গেছেন, এবং বস্তুজগতের উন্নতিতে মগ্ন থেকেছেন। যার ফলে বিজ্ঞানের আজ এত উন্নতি। তা সত্ত্বেও তাঁরা কোন চরম সিদ্ধান্তে এখনও এসে পৌছান নি। এখনও তাঁরা বি(-ষণের পথেই রয়ে গেছেন। নতুন নতুন ধারায় তাঁদের চিন্তা ও কাজ অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই বস্তুবাদের আড়ালে থেকে যে সম্প্রদায় মানুষের মনুষ্যত্বকে, সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজবিরোধী কাজে উস্কানি দিচ্ছে, তাদের বি(দ্ধেই আমার কথা। তারা চরমপন্থী, তারা গোঁড়ামি ও সংস্কারকে ছাড়তে পারে নি। একদল মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে, গ্রহ-ন(ত্রের ভয় দেখিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, যাগযজ্ঞের নামে সমাজকে শোষণ করছে (আর একদল ঠিক বিপরীত কাজ করছে। তারা বলছে—সেন্টিমেণ্ট বলে কিছু নেই। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক—এসব ছেলে ভুলান কথা। তাদের এইসব কথায় উস্কানি পেয়ে এক শ্রেণীর লোকেরা সমাজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে সমাজের বা দেশের কোন সুরাহাই হচ্ছেনা। সুতরাং এদের কোনটাই তোমরা বর্তমানে গ্রহণ করবে না। এই উভয় চরমপন্থীর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত(রাখবে।

আর একটা কথা মনে রাখবে। ঐযে বেদের দুইটি ধারার কথা বলেছি—একটি ভাববাদ, আর একটি বস্তুবাদ—তাদের কোন মতকে তোমরা এখন ভুল বলে উড়িয়ে দিতেও পারবে না। কারণ তারা এখনও তাদের চরম সিদ্ধান্তে এসে পৌছায় নি। এই দুই ধারা থেকে যে দুই চরমপন্থী

গজিয়ে উঠেছে, তাদের কোন মতকেও প্রমাণে না আনা পর্যন্ত নির্ভুল বলে গ্রহণ করবে না। তোমার বুদ্ধির সীমানা যতটুকু, তার মধ্যেই থেকে তুমি তোমার কাজ করে যাও। যা জাননা, যা বুদ্ধির অগম্য—তা নিয়ে হৈচৈ করার প্রয়োজন কি? তুমি শুধু দেখবে—কেউ যেন না জেনে, না বুঝে দুটোর একটাও উচ্চারণ না করে। এখন পর্যন্ত যখন কোনটাই প্রমাণে আসছে না, তখন দুটো কথাই সমাজের উন্নতির পথে বাধা চিন্তা করে, দুটোকেই বর্জন করতে হবে। 'আছে' বা 'নেই'—কোনটা নিয়েই মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এখন যার উপর দাঁড়িয়ে আছ, তার কথা চিন্তা কর। পাপ-পুণ্যের কথা না ভেবে ভাল-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা চিন্তা কর। তোমার কর্ম-পদ্ধতির ধারা এমনভাবে গ্রহণ কর, যাতে তোমার ও তোমার সমাজের খারাপ না হয়ে ভাল হয়। তোমার কাজে তোমার পাপ হবে না পুণ্য হবে, তুমি স্বর্গে যাবে কি নরকে যাবে একথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, তোমার মঙ্গল হবে কি অমঙ্গল হবে, সমাজের কল্যাণ হবে কি অকল্যাণ হবে, দেশ স্বর্গে পরিণত হবে না নরকে পরিণত হবে—সেই কথাই চিন্তা কর। তবে দেখবে, আর কোন সমস্যাই থাকবে না।

যে দুই গোঁড়াপন্থীর কথা বলেছি, তারা সব সময় তোমাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। তোমরা কিন্তু তোমাদের ঠিক রেখো। তোমরা হবে বি(্-ষণমুখী, জ্ঞানপিপাসু। একটা দিকে biased হয়ে কাজ করবে না। তোমাদের মূল পথ হবে জানার পথ। সেই পথে চলতে চলতে যদি দেখ—ভগবান আছে, তবে সেই মতকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করবে না। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত কোন মতকে গ্রহণ করারও দরকার নেই, সে মত শুনে নাসাকুঞ্চন ভ্রূকুঞ্চন করারও দরকার নেই। তোমার কতর্ব্য হলো—নিজেরা সংস্কারমুক্ত(হয়ে, সমাজকে সেই সংস্কারের জাল থেকে মুক্ত(করে আনা। ভালবাসার মাধ্যমেই হোক, আর বিপ-বের মাধ্যমেই হোক, সংস্কারকে নাশ করতেই হবে। ভাল কথায়, ভালভাবে যে একেবারে কিছুই হবে না, তা নয়। কিন্তু বিপ-বের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। জীবন উৎসর্গ করে লড়াই করতে হবে। তোমাদের হাতে থাকবে শাস্ত্রের অস্ত্র—ত্রিশূল, বর্শা, ঢাল, তরোয়াল। এই অস্ত্র ধারণ করে তোমরা বিপ-বের পথে এগিয়ে যাও। তিলে তিলে যারা সমাজকে নিঃশেষ করছে, তাদের বি(দ্ধে তোমাদের অভিযান শু(কর। আর যারা একটা সংস্কারকে ছাড়ার কথা বলতে গিয়ে আর একটা সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেছে, তাদের বি(দ্ধেও তোমাদের জেহাদ ঘোষণা কর।

প্র(় ঃ আপনি যে বিপ-বের কথা বলছেন, সেটা শেষ পর্যন্ত শুধু মারামারি আর হানাহানিতে শেষ হবে না তো?

উত্তর ঃ বিপ-বের পথ সংগ্রামের হলেও মারামারি হানাহানিই এর উদ্দেশ্য নয়। বিপ-বের উদ্দেশ্য প্রেম ও শান্তি। বিপ-বের পথে যখন তুমি নামছ, তখন কাউকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তুমি নামছ না। সমাজের বহুসঞ্চিত ক্লেদগুলো বের করে দেওয়াই তোমার ল(্য ও উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বিপ-বীরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, সমাজকে খুন করে অনাবশ্যক রক্ত(পাত করার জন্য নয়। খুন আর অপারেশন—দুটোতেই অস্ত্র ধরতে হয়। দু'টোতেই রক্ত((য় হয়। দুটোতেই কাতর **ধ্বনি** ওঠে। কিন্তু ঐ দুটো কাজ কি এক? বিপ-ব সমাজকে ভাঙ্গার জন্য নয়, গড়ার জন্য। বিপ-ব সমাজকে নিঃস্ব করার জন্য নয়, ঐ(র্যশালী করার জন্য।

তোমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় যদি উন্মাদ হয়ে যায়, কিম্বা নেশাগ্রস্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তার উন্মত্ততায় ও উৎপাতে তোমার সংসারের শান্তি যদি ভঙ্গ হয়, যদি সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে বসে, তবে তুমি কি করবে? সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য হয় তখন তুমি তাকে হাতে-পায়ে কড়া দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখবে, না হয় তাকে জোর করে ধরে-বেঁধে পাগলা গারদে দিয়ে আসবে। বাইরে থেকে যারা দেখবে, তারা মনে করতে পারে—তুমি খুব নিষ্ঠুর, অত্যাচারী। তোমার পথটা এখানে নির্মম হতে পারে, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য এখানে মহৎ—সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং যে অসুস্থ তাকে সুস্থ করে তোলা। বিপ-বও সেইরকম। বাইরে থেকে এর পথটাকে দানবিক মনে হলেও উদ্দেশ্যটা মানবিক।

কতকগুলো উন্মাদের হাতে পড়ে, আজকের সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এদের উৎপাত থেকে সমাজকে র(া করতে হলে এবং এই উন্মাদদের অজ্ঞানতার হাত থেকে বাঁচাতে হলে বিপ-বেরই প্রয়োজন।—আমি বিপ-বে বি(াসী।

প্র(় ঃ আপনি তো বিপ-বে বি(াসী। নকশালরাও বিপ-ব চায়। আপনি কি তাদের সমর্থন করেন?

উত্তর ঃ তোমাদের তো বহুবার বলেছি—কে নকশাল, কে C.P.M., কে C.P.I. ঐসব আমি একেবারেই বুঝি না। আমি বুঝি প্রকৃতির নীতি, সমতার নীতি। আমি বুঝি বেদের নীতি, সাম্যের নীতি।—এক কথায়, যা চিরন্তন সত্য, তাই আমি বুঝি। আর বুঝি, সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিপ-ব অর্থাৎ গঠনমূলক সংগ্রাম। **ধ্বং**স করাই বিপ-বের শেষ কথা নয়। একটা মহৎ কিছু গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। নকশালরা যে বিপ-বের কথা বলছে, তার উদ্দেশ্যও যদি গঠনমূলক হয়, তবে তাদের সমর্থন না করার কি আছে? আজ আমাদের স্বদেশ ও সমাজ ভেজাল, দুর্নীতি ও কুসংস্কারের চাপে পড়ে **ধ্বং**স হয়ে যেতে বসেছে! যারা তাকে র(া করার চেষ্টা করবে, তারা যে দলেরই হোক, আমি তাদের সমর্থন ক'রব।

স্বজনকে র(া করতে যেমন আমরা বদ্ধপরিকর, আমাদের সমাজকে র(া করার জন্যও তেমনি বদ্ধপরিকর হতে হবে। তোমার পরিবারের প(্ মশা-মাছি (তিকর, সংত্র(ামক ব্যাধির বাহক (সেজন্য তুমি তাদের বিনাশ করতে দ্বিধা করছ না। এটা তোমার পরিবারের মঙ্গলেরই জন্য। সমাজ হচ্ছে তোমারই একটা বৃহৎ পরিবার। তাকে র(া করার জন্য তার (তিকর জীবাণুগুলিকে, সংত্র(ামক রোগের বাহকগুলিকে-মশামাছির মত নষ্ট করতেই হবে। তুমি যে নকশালদের প্রসঙ্গ তুলেছ, তাদের উদ্দেশ্য যদি সমাজকে এই মশা-মাছির হাত থেকে র(া করা হয়, তবে তাদের সমর্থন না করার তো কারণ দেখি না! তবে একটা কথা কি জান? যে কোন কাজের আগে সব সময় warning দিতে হয়। সংশোধন করতে হলেও সাবধান করতে হয়। আদি বেদেও বিপ-বের আগে সাবধানসূচক বাণীর কথা বলেছে। বিভিন্ন শাস্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি চর্চা করলে দেখতে পাবে—সব জায়গায়ই বিপ-বের কথা বলা হয়েছে। বিপ-বের আগে সাবধান করে দেওয়াও হয়েছে। সেই সাবধান-বাণী শুনে যখন

কেউ নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে, তখন তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করা হয়েছে। যখন তা নেয়নি, তখনই শয়তান-শোষক হিসাবে তাদের বি(দ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে, যুগে যুগে বেদের সমর্থকরা আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজকে অত্যাচার, কুসংস্কার ও ধ্বংসের হাত থেকে র(া করার জন্য, এবং ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্-ব করে এসেছেন। কু(ে(ত্রের যুদ্ধ সেই রকম একটি বিপ্-বেরই কাহিনী। শ্রীকৃষ(অত্যাচারীদের বিনাশ করে ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যই অস্ত্র ধরেছিলেন, সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। সে যুদ্ধের আগে তিনি নিজে দূত হয়ে দুর্য্যোধনের সভায় গিয়ে তাদের সাবধানও করে দিয়েছেন। যখন সে তাঁর কথা শোনেনি, তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বলরাম তাঁর হালের সাহায্যে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজাদের রাজধানীশুদ্ধ উৎপাটিত করে দিয়েছেন। তাতে কি কৃষিবিপ্-বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না? শ্রীকৃষে(র কাছে তাঁর পরম-আত্মীয় মাতুল কংস পর্য্যন্ত (মা পায়নি। শ্রীরামচন্দ্রের কার্যবিধি বি(-ষণ করলে দেখবে—তিনিও বিপ্-বে বি(াসী। রা(স বংশ, অর্থাৎ যারা সকলের রক্ত(শুষে খায় সেই শোষকশ্রেণীর কবল থেকে ধরিত্রীকে উদ্ধার করার জন্যই অস্ত্র ধরেছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ রাবণকে বধ করেছিলেন। অত্যাচারী বালিকে দমন করেছিলেন। সকল (ে ত্রেই আগে সাবধানও করে দিয়েছেন।

মহাবীর তার বিপুল বাহিনী নিয়ে রামকে সাহায্য করায় তাঁর প(অন্যায় ও অসত্যকে বিনাশ করে ন্যায়, সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছিল। মহাবীর আর তার বাহিনী জনগণের প্রতীক, গণশক্তি(রই প্রতীক। জনগণ সাড়া না দিলে বিপ্-ব কখনই সার্থক হয় না। জনগণকে জাগাতে হলে তার সহানুভূতি আকর্ষণ করা আগে দরকার। বিপ্-বের সেটাই প্রথম কথা। আর এক মহাবিপ্-বী বিভীষণ। সমাজে এদের মত ব্যক্তি(খুব কম, যারা রা(সদলের মধ্যে থেকেও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। নীতি ঠিক রেখেছে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কথা চিন্তা করেনি। আগেই বলেছি, রা(স বলে কোন আলাদা জাতি বা গোষ্ঠী নেই। সেটা হচ্ছে একটা সম্প্রদায় বা শ্রেণী, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমাজের বুকের উপর বসে সমাজেরই রক্ত(শোষণ করে চলেছে, অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের সঞ্চয় ও সম্পত্তি বাড়িয়েই চলেছে। এই রা(সের দল আজও আমাদের সমাজকে ঘিরে আছে। আজও তারা আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে শাসনের নামে শোষণ করেই চলেছে। এদের হাত থেকে দেশকে র(া করতে হলে বিপ্-বেরই প্রয়োজন।

আমার সন্তান দলের মধ্যে সবরকম মত ও পথের লোকই আছে। তারা 'হাল' হাতেও আসে, আবার আজকাল 'শাল' নিয়েও আসছে। তাদের হাতে হাতুড়ীও আছে, মাথায় চাতুরীরও অভাব নেই। সকলের সঙ্গে আমি আলাপ করি। নানা রকম আলোচনা হয়। কত রকম যে কথা তারা আমায় বলে (কোনটা বুঝি, কোনটা বুঝিনা। তবে একটা জিনিস দেখি—সবাই শান্তি চায়, সবাই চায় দেশে শৃঙ্খলা ফিরে আসুক,—সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক।

আমাদের হাজার হাজার বছর পূর্বের আদি বেদ এমন একটি জ্ঞানের আধার, যার থেকে সকলেই সব রকম খোরাক গ্রহণ করতে পারে—কি মনের, কি দেহের (কি ব্যক্তি(র, কি সমাজের। মনের বা দেহের বিকাশ সাধন করতে চাও—বেদ অধ্যয়ন কর(ব্যক্তি(র বা সমাজের যাবতীয় উন্নতি সাধন করতে চাও—বেদ চর্চা কর। দেখবে, তার থেকেই সকল কিছুর ফরমুলা পেয়ে যাবে। এই বেদের সাম্যবাদভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য যারা যারা চেষ্টা করছে, তারা যে দলেরই হোক, আমি তাদের সঙ্গে হাত মেলাব।

শিকারীকে শিকার ধরিয়ে দিলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে

প্র(্ ঃ আপনি তো বার বার বিপ্-বের কথা বলছেন, কিন্তু কোন পথে বিপ্-ব আসবে—তা তো বুঝতে পারছি না। এখানে-ওখানে বিপ্-বের নামে যা হচ্ছে, তা বেশীরভাগই জনগণ মেনে নিতে পারছে না। এমন একটি বিপ্-বের পথের নির্দেশ দিন, যে পথে গেলে সকলকার সমর্থন ও সহানুভূতি পাওয়া যাবে।

উত্তর ঃ জানতো, আমাদের দেশ একদিন বিপ্-বের দেশ ছিল। আজকের সমাজ সেদিন থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে! একদিন আমাদের দেশে শি(া-দী(া, খাওয়া-পরার কোন অভাব ছিল না। অন্যায়ের বি(দ্ধে লড়াই ছিল তাদের নীতি। আর আজ না খেয়ে লোকেরা মরছে—তবু সংগ্রাম করছে না। এই হচ্ছে আজকের দেশের পরিণতি। আবর্জনা থেকে কুড়িয়ে খাওয়া তারা ভাল মনে করছে, কিন্তু খাওয়া-পরার জন্য লড়াই করাটা তাদের কাছে পাপ। এই দেশে বিপ্-ব জাগাতে হলে শুধু 'বিপ্-ব, বিপ্-ব' বলে চিৎকার করলে হবে না। কেন হবে না, তার কারণ আমি অনেকবার বলেছি। ছোবলে বিষাক্ত(হয়ে গেছে দেশ। সেই বিষকে ছোবল দিয়েই বার করতে হবে। যে বেদ ছিল যুক্তি(ও জ্ঞানের আধার, স্বার্থান্বেষীদের চক্র(ান্তে সই বেদের বাণী বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলেই আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষক্রি(য়া শু(হয়েছে। সমাজকে বিষমুক্ত(করতে হলে সেই আদি বেদকেই সামনে ধরতে হবে।

বেদের বেত্রাঘাতেই সমাজের বিষ ছাড়াতে হবে। আজ দেশে সোনার দাম আর চালের মণের দাম এক হয়ে যেতে বসেছে। তেল ও ঘিয়ের দাম এক। শয়তানের প্রভাব কতটা হলে এগুলো হতে পারে! শয়তানকে দমন করাই হলো তোমাদের আজকের কাজ। ভারতবাসীর রক্তে(আজও বিপ্-বের বীজ আছে। তাদের আবার বিপ্-বমুখী করতে হলে প্রথম কাজই হলো—জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা। তাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে হলে, তাদের যারা (তি করছে, সমাজের সেই (তিকর জীবাণুগুলোর সন্ধান দিতে হবে। শিকারী চায় শিকার করতে। শিকারীকে শিকার ধরিয়ে দিলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।—এটাই রীতি।

আগেকার দিনে দেশকে, জাতিকে র(া করার জন্য বিপদের সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানেই র(ীবাহিনী রাখা হতো। পাহাড়, জঙ্গল, সাগর থেকে প্রায়ই হিংস্র জীবজন্তুরা এসে ছাগ, গাভী, মানুষ ইত্যাদি খেয়ে ফেলত। এই হিংস্র পশুদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই শিকারীদের পাহারা রাখা হলো। শিকারীদের অস্ত্রে অনেক হিংস্র জন্তু খতম হ'লো, আর বাকিরা ভয়ে পালিয়ে গেল। এইভাবে তাদের উৎপাতও বন্ধ হলো (মানুষরাও শান্তিতে বসবাস শু(ক'রল। আজকের সমাজও অনেক হিংস্র জীবের দ্বারা আক্র(ান্ত। মানুষের বেশে এই হিংস্র জীবেরা নানাভাবে আজ সমাজকে গ্রাস করতে আসছে। সাথে সাথে তাদের বিষাক্ত(নিঃশ্বাসে সমাজের প্রতিটি বিভাগ বিষময় হয়ে উঠেছে। আজকের বিপ্-ব হবে—ঐ হিংস্র জীবদের গ্রাস থেকে সমাজকে উদ্ধার করা। তার জন্য প্রথম কাজ হবে—হিংস্র জীবের ঘাঁটিগুলোকে খুঁজে বার করা।

আমি শুধু কয়েকটার ইঙ্গিত দিচ্ছিমাত্র।—প্রথম দৃষ্টি দাও ভেজালের দিকে। যে দেশে একদিন এক পয়সা দু'পয়সায় খাঁটি দুধ ঘি পাওয়া যেত, আজ সেই দুধ ঘি গেল কোথায়? সব সেই হিংস্র জীবেরা শুষে নিয়েছে। আজকাল তেল, ঘি, দুধ, আটা, ময়দা, চিনি এমনকি ঔষধে পর্যন্ত ভেজাল মিশিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে। এই ভেজাল ব্যবসায়ীদের বি(দ্ধে হবে তোমাদের সংগ্রাম। খুঁজে খুঁজে বার কর তাদের। তারপর এমন সাজা দাও, যাতে তারা ভেজালের চিন্তাও আর করতে না পারে।

তারপর যাও বিভিন্ন অফিসে, স্কুলে, কলেজে। খুঁজে দেখ—সেখানেও ভেজাল। ঘুষ ছাড়া আজ যেন কা(র আর কোথাও গতি নেই। গুণের আদর নেই, যোগ্যতার দাম নেই, পরিশ্রমের মূল্য নেই। যে ঘুষ দিতে পারল, তারই সকল জায়গায় অগ্রাধিকার।—এগুলো বন্ধ করতে হবে। ঘুষ যে নেবে, আর ঘুষ যে দেবে—দুজনকেই হাত-পা বেঁধে সাজা দিতে হবে। যেখানে দেখবে প(পাতিত্ব, সেখানেই হামলা করবে। তোমরা দেখবে, যাতে সমাজের প্রতিটি বিভাগে সকলেই সকলের সঙ্গে সমান সহানুভূতিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহার করে। কেউ যেন অবহেলিত না হয়।

সমাজের চরম (তিকারক হলো পুঁজিবাদীরা। বেদ বলেছে—এরাই দেশের পরম শত্রু। দেশের সমস্ত অভাবের মূল কারণই হলো ওরা। যে দেশে ফসল ছিল অফুরন্ত, আজ সেই দেশের আলো হাওয়া জল মাটি সবইতো ঠিক আছে, গাভীও ঠিক আছে (জনও বাড়ছে, জমিও বাড়ছে—তবে ফসল গেল কোথায়? নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই পুঁজিবাদীরা খাদ্যকে এক জায়গায় আটকে রেখে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করছে, আর বাজারদর বাড়াচ্ছে। এদের কখনই (মা করবে না। পুঁজি বন্ধ কর—দেখবে জনগণ খেয়ে-পরে বাঁচবে। তখনই তাদের সহানুভূতি পাবে।

দেশের লোকের খাদ্য-বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে যাতে শি(া পায়, সেই দিকেও নজর দেবে। আজ শি(া বিভাগেও গলদ ঢুকেছে। শি(াকে নিয়েও ব্যবসা চলছে। এখানে ওখানে সব রাতারাতি স্কুল কলেজ গজিয়ে উঠছে, অথচ দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ে শি(া পেল কিনা, সেদিকে তারা নজর দিচ্ছেনা। স্কুলের বেতন পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছুই আছে। সাধারণ লোক কি করে তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবে? তারপর বই নিয়ে, খাতা নিয়ে ব্যবসা চলছে (এমন কি প্র(্ এবং পরী(ার নম্বর নিয়েও ব্যবসা চলেছে। তোমরা সমস্ত স্কুলে স্কুলে চলে যাও এবং এগুলো বন্ধ কর। দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায়, তার ব্যবস্থা কর। হাসপাতাল ও জেলের ভেতরকার বিবরণ যদি খুলে বলি, তবে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠবে (মাথায় খুন চাপবে। কিন্তু খুন করার দরকার নেই—অপারেশন করে তোমরা ক্লেদগুলো বার করে দাও।

আমাদের দেশের বেশীরভাগ হাসপাতালগুলো দেখলে দুঃখে বুক ফেটে যায়। রোগীদের প্রতি অবিচার, অত্যাচার, অবহেলা তো আছেই। তাদের ভাল করে ঔষধ পথ্য পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। খোঁজ করে দেখ, এদের জন্য যে সমস্ত খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে, সেগুলো কোথায় যাচ্ছে।—তারপর তার বিহিত কর।

তারপর কর্পোরেশনের দিকে তাকাও। তার তো প্রতিটি ইঁটে সেপ্‌টিক ধরেছে। চামড়া, মাংস তো কেটে বাদ দিতেই হবে, হাড় পর্য্যন্ত চেঁছে ঠিক করতে হবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে কর্পোরেশনে কত টাকা উঠছে, কত রকম কন্ট্রাক্টে টাকা আসছে—সে সমস্ত একত্র করলে সমস্ত বাংলা দেশের খরচা চলে যায়। কিন্তু সে টাকা যাচ্ছে কোথায়? চারদিকে তাকালে কর্পোরেশন কিছু কাজ করছে বলে তো মনে হয় না। এর একটা বিহিত কর। জনগণ যখন দেখবে রাস্তাঘাট ঝক্ ঝক্ করছে, যানবাহন ঠিকমত যাচ্ছে, সাধারণ লোকেরা basic needs-গুলো ঠিকমত পাচ্ছে, তখন তোমাদের উপর সহানুভূতি তাদের আপনি জেগে উঠবে।

প(পাতিত্বের গন্ধ যেখানে পাবে, সেখানেই প্রতিবাদ জানাবে। দেখবে, সংবাদপত্রগুলো যেন নিরপে(হয়। সংবাদপত্র হচ্ছে দেশের প্রতিনিধিস্থানীয়। তুলাদণ্ডের মত তাদের বিচার হবে সমান। তারা অনাবশ্যক কাউকে নীচে নামাত্রেহুট্রর্ড্রট্রত্ম ত্নত্ত৫ ড্ডড্ডড্ডুলবে না। সেখানেও তোমাদের অভিযান চালাও। দেখ, তারা ধনী-দরিদ্র দলমত-জনমত নির্বিশেষে সকলকার খবর নিরপে(ভাবে দিচ্ছে কিনা। যদি দেখ, কোন পত্রিকা কা(রে প্রতি ব্যক্তি(গত আত্রে(াশ মেটাচ্ছে, প(পাতিত্ব করছে, নিজেদের খেয়ালখুশী মত সংবাদ পরিবেশন করছে, তখন সেই সংবাদপত্রকে দেশে চালু হতে দেবেনা।

বিচার করে দেখবে, রাজনীতিক দলগুলি সত্যই দেশহিতের কাজে লেগেছে কিনা। যদি দেখ, মুখেই তারা দেশের কল্যাণের কথা বলছে, কাজে কিছু নয়, তৎ(ণাৎ তাদের জঞ্জালের মত দূরে ঠেলে দেবে।

ধর্মব্যবসায়ীদের বি(দ্ধে অভিযানের কথা তো বহুবার বহুপ্রসঙ্গে বলছি। তোমরা দলে দলে বিভক্ত(হয়ে চারিদিকে দূত পাঠিয়ে দাও। হাটে-বাজারে, রাস্তায়-ঘাটে, সরকারী বিভাগে, প্রাইভেট লিমিটেড—সর্বত্র তোমরা ল(্য রাখ, কে কোথায় কিভাবে সমাজকে বিষাক্ত(করছে। সেগুলোর লিষ্ট তৈরী কর। তারপর এক একটি ধরে ধরে বিহিত শু(কর। জনসাধারণকেও হ্যাণ্ডবিলের মাধ্যমে সবকিছু জানিয়ে দাও। দেখবে, তোমাদের জন্য জনগণের সহানুভূতি আপনিই জেগে উঠবে। তারা নিজেরাই তখন আরও কত গলদের গোপন খবর তোমাদের জানাবে। নেশাগ্রস্ত হয়ে তারা তখন চারিদিক থেকে দুর্নীতির সংবাদ সংগ্রহ করে তোমাদের সরবরাহ করবে। তোমাদের কাজের সুবিধা হয়ে যাবে।

তারপর প্রতিবিধানের জন্য যখন নামবে, তার আগে বেদের নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে সকলকে দু'একবার সাবধান করে দেবে। তাতেও যদি না শোধরায়, তখন কাজে নেবে যাবে। দেখবে, কাউকে তোমাদের আলাদা ভাবে ডাক দিতে হবে না। সকলে নিজে থেকে এসে তোমাদের সাথে যোগ দেবে। শিকারী শিকারের সন্ধান পেয়েছে—এবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিপ্‌-ব আপনিই জেগে উঠবে।

প্র(্ন ঃ আপনি যে এসব কথা বলছেন, পুলিশ তো আপনার বি(দ্ধে লোক (াপানোর অভিযোগ তুলতে পারে!

উত্তর ঃ আমার এসব কথা উচ্ছৃঙ্খলতার উস্কানি নয়। পুলিশের ধমনীতে যদি দেশী রক্ত(থাকে, তাদের যদি শয়তানের সঙ্গে আত্মীয়তা না থাকে, তবে তারা আমার মত সমর্থনই করবে। আর যদি সে রক্তে(র ধারা ক্লাইভের আমলের হয়ে থাকে, তবে বুঝবো—'শয়তান দমন' তাদের নীতি নয়, 'শয়তান পোষণ' তাদের নীতি। তাতে আমার আর কি (তি হবে? তোমাদের কাজ আর একটু বাড়বে। আর একটা বিভাগে তোমাদের নজর দিতে হবে।

আকাশ লাল! উদয়ের ... না অস্তের?

—ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী

প্র(ঃ এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা চলছে, সাধারণ নিরীহ লোকদের জীবন নিয়ে পথ চলাই একটা সমস্যা। এমনি আর কতদিন চলবে?

উত্তর ঃ এ আর কি? সামনে আরও আসছে। এইতো সবে শু(। আগে যেখানে কথায়-কথায় কিল চড় থাপ্পড় চলত, এখন সেখানে বোম বুলেট বেয়নেট চলছে। আগে ছিল problem-solve এর (সমস্যা সমাধানের) সেটাই normal উপায়। মনে হচ্ছে, এখন এটাই হয়েছে normal. সমাধানে না আসা পর্যন্ত এমনই চলবে।

প্র(ঃ নিরীহ জনসাধারণের উপর এ অবিচার কেন? তাদের কি দোষ?

উত্তর ঃ দোষীদের সাথে থাকলে, দোষ না করলেও দোষী বনতে হয়। সবাই আজ ঠগের জায়গায়। কেউ ঠকছে, কেউ ঠকাচ্ছে—দুটোই দোষ। আর দু' একজন আছে, যাদের আমরা নিরীহ লোক বলি, তারা ঠকতেও চায় না, ঠকাতেও চায় না। তাই বেচারারা ঐ ঠোকাঠুকির মাঝে পড়ে শুধু ঠোক্করই খাচ্ছে। তাদের দোষ হলো, ঠোক্কর খেয়েও তারা চুপ করে আছে, (খে দাঁড়াচ্ছে না। 'ঠকবো না, ঠকাবো না'—এটা খুবই ভাল কথা। বেদও বলছে—কখনও কাউকে ঠকাবে না, নিজেও কখনও ঠকবে না। তার সঙ্গে বেদ আরও বলছে—যারা ঠকাচ্ছে, তাদের কখনও (মাও করবে না। যারা ঠকাচ্ছে, তাদের বি(দ্ধে কোনরকম action নেবে না—এটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। আজকের দিনে অন্যায়ের বি(দ্ধে কঠোর প্রতিবাদ নেই বলেই নিরীহদের প্রতি পদ(পে হোঁচট খেতে হচ্ছে, প্রাণ নিয়ে টানাটানি চলছে। এরকম নিরীহদের আমি কখনই প্রশংসা ক'রব না। তারা ভী(, দুর্বল, কাপু(ষ।

প্র(ঃ সমাজের বুকে এই যে অত্যাচার অবিচার চলছে, এর জন্য আপনার মতে দায়ী কারা?

উত্তর ঃ প্রথমতঃ জনসাধারণ, দ্বিতীয়তঃ সরকার।

প্র(ঃ জনসাধারণ কি করে হয়? তারা তো কখনই চায় না এরকম অত্যাচার হোক!

উত্তর ঃ সত্যিই অত্যাচার কেউই চায় না। কিন্তু যখন অত্যাচার হচ্ছে, তখন তার বি(দ্ধে যদি (খে দাঁড়ান না হয়, তবে প্রকারান্তরে অত্যাচারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। আজ আমাদের দেশের অত্যাচার অবিচারের বি(দ্ধে কোনরকম লড়াই বা প্রতিবাদ তো কেউ করছে না! যেটুকু হচ্ছে, তুলনামূলক ভাবে সেটা কিছুই নয়। জনগণ তো চুপ করে মেনে নিচ্ছেই, সরকারের তরফ থেকেও কোন বিহিত হচ্ছে না। তার উপর আবার আছে সরকারি ট্যাক্স। একেই তো সমাজ মরার পথে, তার উপর আবার খাঁড়ার ঘা পড়ল। যাও করে খাচ্ছিল, তাও নিঃশেষ। ব্যবসাগুলো লাটে উঠলো, মিল ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যেতে বসল। বেকার সমস্যা বাড়তে লাগল। কাজকর্ম না থাকায়, পেটের দায়ে লোকের মনে চুরি ডাকাতির চিন্তা ত্র(মশঃ বেড়ে যাচ্ছে। না খেয়ে তো থাকতে পারে না, কাজেই হামলা করছে। অভাব যত বাড়ছে, স্বভাব তত নষ্ট হচ্ছে (মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি ততই বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এইতো শু(। সরকারের প(কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ দড়িতে এতটা টান দেওয়া উচিত হয়েছে কি?

সমাজ আজ চরমভাবে নির্যাতিত। জনগণের সকল সমস্যার ঠিকমত মীমাংসা তো হচ্ছেই না, তার উপর আবার কতভাবে যে নির্যাতন চলছে, সে তো দিনের পর দিন চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। এভাবে কি সুশাসন হয়? সমূহ দমিয়ে রাখা যায় মাত্র। একদিক দমিত হলে, আর একদিক ফুলে ওঠে—এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সেই স্বাভাবিক নিয়মেই জনসাধারণের একটা দিক আজ ফুলে, ফেঁপে গর্জে উঠেছে। যত তাদের উপর দমননীতি চালান হচ্ছে, ততই তারা আর একদিক থেকে আর একভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। "যা হবার হোক, দেখি কি করতে পারে"—এই বলে এগিয়ে আসছে।

আজকের এই পরিস্থিতি সরকার ও সাধারণের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। তাই আমার ধারণা, এর জন্য উভয়েই দায়ী। জিদেই জিদ বাড়ছে। একপ(জিদ করছে—যেভাবে হোক জনগণকে পিটিয়ে দমন ক'রব (জনগণও ভাবছে—অন্যপ(কে এবার খেল দেখাচ্ছি। মারামারি করে দুই প(ই মরবে।

প্র(ঃ আচ্ছা, নকশালদের সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

উত্তর ঃ ওদের উদ্দেশ্য ও কার্য সম্বন্ধে প্রত্য(ভাবে আমি কিছুই জানি না। তবে আমার এখানে প্রতিদিন বহু দলের, বহু রকমের লোক আসে। সকলের সঙ্গেই আমার আলাপ হয়। তাদেরই কাছে আমি নকশালদের সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি এবং জেনেছি, তাতে মনে হয় নকশালরা এবার শাল চোখা করে নিয়ে এগিয়ে আসছে। অবশ্য সত্য মিথ্যা জানি না, এ আমার শোনা কথা। আমি আরও শুনেছি, তারা বলে—সোনা যেমন পুড়িয়ে গলিয়ে তারপর অলঙ্কার গড়তে হয়, তেমনি তারা পুরোনো, ঘুণে-ধরা সমাজকে ভেঙ্গেচুরে, পুড়িয়ে ফেলে তারপর নতুন করে ঢালাই করবে। এটাই নাকি তাদের উদ্দেশ্য। তা যদি হয়, তবে তো খুবই ভাল কথা। আমাদের শাস্ত্রও সেই কথাই বলে—'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।' আমিও বলি—অন্যায়, অসত্য, অসাধুতার বি(দ্ধে তীব্র প্রতিবাদ কর। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্-বের দণ্ড নিয়ে এগিয়ে এসো। এটা উস্কানির কথা নয়, বেদেরই কথা।

প্র(ঃ আপনি নকশালদের সমর্থন করেন কি?

উত্তর ঃ আমার সমর্থন সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক। বেদের কথা আগেও বলেছি। রা(সের হাত থেকে দেশকে মুক্ত(কর। আজ আমাদের দেশ রা(সেরই কবলে। যারা তাদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য ও তাদের বিনাশ সাধনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের মত ধনুর্বাণ ধরে এগিয়ে আসবে, সংগ্রাম করবে—তাদের আমি সমর্থন ক'রব। এখন পর্যন্ত যে

কেউ তেমনভাবে এগিয়ে আসছে না, সেটা খুবই দুঃখের। নকশালরা যদি সত্যি-সত্যিই এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রা(সবংশ **ধ্বং**স করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তো খুবই ভাল কথা। তা বলে অযথা মারামারি, কাটাকাটি হোক—তা কখনই চাইনা, সমর্থনও করিনা।

প্র(ঃ নকশালরা তো অনেক (ে ত্রে অযথা মারামারি কাটাকাটি করছে। খুন জখম তো করছেই, তাছাড়া স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী পোড়াচ্ছে, দেশনায়কদের মূর্ত্তি ভাঙ্গছে। এগুলো কি ভাল করছে?

উত্তর ঃ আজকে যা সব হচ্ছে, তা তুমি-আমি কেন, যারা করছে তারাও সমর্থন করে না। করতে পারে না। তা সত্ত্বেও তারা কেন করছে, সেটাই ভাববার বিষয়। সেইজন্যই আমি এখনও তাদের সকল(ে ত্রে বুঝে উঠতে পারছি না। আমার বুঝতে সময় লাগছে।

নকশালরা যখন বলছে—জনগণকে আজ না খাইয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে, যারা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জনসাধারণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে সেই সব অত্যাচারীদের বি(দ্ধে তাদের এ অত্যাচার, তখন আমি তাদের যুক্তি(বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন তারা লাইব্রেরী পোড়াচ্ছে, দেশনায়কদের প্রতিমূর্তিতে কালি মাখাচ্ছে, তখন আমার তাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। কি উদ্দেশ্যে যে এগুলো তারা করছে, তা আমি সঠিক বুঝতে পারছি না। উন্মত্ত অবস্থায় বিড়ালের বাচ্চার খেয়ালই থাকেনা নিজের মায়ের কথা। যত(ণ পর্যন্ত শিকার না পায়, তেত(ণ পর্যন্ত সে মা-বিড়ালের লেজেই থাবা দিতে থাকে। মাঝে মাঝে কামড়ও দেয়, তখন কি আর মা বলে খেয়াল থাকে? তাই আমার মনে হয়, এরাও বোধ হয় ি(প্তার চরমে উঠছে।

বন্যার জল যখন প্রলয়ের তাণ্ডব রূপ ধরে ছুটে আসে, তখন 'আমার বাড়ী' 'তোমার বাড়ী' চিন্তা করে আসে না। ত্র(মশঃ ত্র(মশঃ ধাপে ধাপে এগিয়ে আসতে থাকে। সামনে যা পায়, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। কত বাড়ী, দোকান, মন্দির, শি(া-প্রতিষ্ঠান তলিয়ে যায়। এরা সেই ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পলিসি নিয়ে এগিয়ে আসছে কিনা কে জানে?

আমি অনেকের মুখে শুনেছি, নকশালরা নাকি বলতে চায়, "যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভেজালের আগাছা উঠেছে, সেগুলো শি(া-প্রতিষ্ঠানই হোক, আর জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হোক, সেগুলো আগাছাই। ওগুলো ছেটে ফেললে, অনেক কাজই হবে। ভেজাল নিরোধও হবে, আগাছা কেটে কেটে দা' শানানও হবে, আবার বৃহত্তর কাজের জন্য হাত পাকানও হবে।" আমি এও শুনেছি, হাত পাকানর মত ওরা নাকি আবার মনও পাকায়।

প্র(ঃ মন পাকায়? সেটা আবার কি?

উত্তর ঃ আমার কাছে তো অনেক রকম লোকই আসে। তাদের কাছেই শুনেছি, ওরা নাকি মাঝে মাঝে দল বেঁধে কসাইখানায় যায়। যেখানে হাজার হাজার গ(একসঙ্গে কাটা হয়, সেখানে তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে আর মন পাকায়।

প্র(ঃ মন পাকান—এমন কথা তো আর কোন দিনও শুনিনি!

উত্তর ঃ তাদের চিন্তাধারা হচ্ছে, সরকার তো এইসব নিরীহ গ(দের এইভাবে কাটার 'লাইসেন্স' দিচ্ছে! এক শ্রেণীর ব্যবসার জন্য এইভাবে নিষ্পাপ প্রাণীদের হত্যার অনুমতি যদি দেওয়া হয়, আর তাতে যদি কোন (তি না হয়, তবে দুর্নীতি ও ভেজালের ডিপোগুলোকে **ধ্বং**স করে ফেলাতেও কোন (তি হওয়ার কথা নয়। এইভাবে চিন্তা করে তারা নাকি নিজেদের তৈরী করে।

ভেবে দেখলে তাদের কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নকশালরা দেশের যা (তি করছে, তার সহস্রগুণ বেশী (তি বহু আগে থেকেই হয়ে আসছে এবং এখনও হচ্ছে। পুঁজিবাদীদের, ভেজাল কারবারীদের, ধর্মব্যাবসায়ীদের, ঘুষসমর্থকদের কার্যকলাপে সমাজের (তি হয়েছে অনেক বেশী। কত অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার, কন্ট্রাকটার, হোমরা চোমরা কত ব্যক্তি(কতভাবে যে দেশের (তি করছে, তার হিসাব আমার চেয়ে তোমরাই হয়তো বেশী জান। সে সবের হিসাব আগে নাও। কোটি কোটি টাকা নিয়ে আজ ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। বড় বড় ব্রীজ, বাঁধ তৈরী করা হচ্ছে (দুদিন যেতে না যেতেই **ধ্ব**সে পড়ছে। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে, সিমেন্টের বদলে গঙ্গামাটি দিয়ে কাজ চালান হয়েছে। বড় বড় রাস্তা তৈরী হলো, কিছুদিন পরেই তাতে ফাটল ধরছে। বড় বড় অফিস, building, কোয়ার্টার্স বানান হচ্ছে (প্রথম বর্ষাতেই ছাদ দিয়ে জল ঝরছে, জানলা কপাট ভেঙ্গে যাচ্ছে। এতে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হচ্ছে না? এক একটা বিভাগের জন্য যত অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে, কোন্ অদৃশ্য উপায়ে সেগুলো উড়ে যাচ্ছে, সেটা আগে খুঁজে বার কর। এ ছাড়া বেনামীতে জমি, সোনা, গহনা—এ সব দুর্নীতি তো আছেই। এ সব যারা করছে, তারা এখনও সমাজের বুকের উপর বসে দাপটে রাজত্ব করছে। এ সব (তি যদি বন্ধ করতে পার, তবে দেখবে নকশালদের দ্বারা যতটুকু (তি হচ্ছে তা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে।

হাসান-হোসেনকে যেমন কোণঠাসা করে, খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, আজ আমাদের দেশের অবস্থা সেই রকম। দেশবাসী আজ কারবালার প্রান্তরে। জনসাধারণ আজ অনাহারে মরতে বসেছে। (ু ধায় যখন তারা ছট্‌ফট্ করছে, খাদ্যের দাবী জানাচ্ছে, তখন তাদের দিকে বুলেট-গুলি ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে। (ু ধার্ত জনসাধারণকে যদি খাদ্যের বদলে বুলেট বেয়নেটের খোঁচা খেতে হয়, তবে তারা ি(প্ত, উন্মত্ত হয়ে উঠবে না? চারিদিকে যখন দাউ দাউ করে (ু ধাগ্নি জ্বলছে, তখন কেউ যদি প্রাসাদের চূড়ায় বসে, ধরা ছোঁওয়ার বাইরে থেকে নিরোর মত ভায়োলিন বাজায় আর সে দৃশ্য উপভোগ করে, তখন কি কেউ স্থির থাকতে পারে? পেটে যখন আগুন জ্বলছে তখন compromise চলেনা। ভায়োলিনের সুর তখন সুধা বর্ষণ করে না, ভায়োলেন্টই করে তোলে। আজ যে জনসাধারণ মরিয়া হয়ে উঠেছে সেটা অস্বাভাবিক নয়। শিকারীর গুলিতে বাঘ যদি একবার আহত হয়, তবে মরার আগে সেও একবার মরণ-কামড় দেওয়ার চেষ্টা করে। শিকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে হয় এবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে।

বেদের নীতিকে সামনে রেখে, শাস্ত্রকে অস্ত্র করে নকশালরা যদি সত্যিই শয়তান আর শয়তানি উচ্ছেদের জন্য কাজে নেমে থাকে, সত্যিই যদি তারা আন্তরিক ভাবে দুর্নীতি দমনের জন্য এগিয়ে আসে, তবে আজ হোক, কাল হোক জনগণের স্বীকৃতি তারা পাবেই। আর যদি শুধু সমাজবিরোধী কাজেই তারা লিপ্ত থাকে, তবে লুপ্ত হতেও বেশী দেরী লাগবে না।

এর পরও যদি ব্যক্তি(গতভাবে আমার সমর্থন-অসমর্থনের কথা জিজ্ঞাসা কর, তবে আমি বলব, আমি আপন মনে ছিলাম। হঠাৎ চমক লেগে তাকিয়ে দেখি—আকাশ লাল! চমকানির ঘোরটা এখনও কাটেনি তো! তাই সঠিক বুঝতে পারছিনা—রংটা উদয়ের, না অস্তের!

প্র(্ন ঃ আপনাকে অনেকে বলে, আপনি C.P.M. আবার অনেকে বলে, আপনি নকশাল। কোন্‌টা ঠিক? আপনি কোন্ প(ে ?

উত্তর ঃ আমি শুক্লপ(ে ও নেই, কৃষ(প(ে ও নেই। আমি নিরপে(। আরও যদি সহজ করে বলতে বল, তবে বলব—আমি ন্যায়ের প(। আমি কোন পার্টিতেও নেই, পলিটিক্সেও নেই। মধুকরের মত যার মধ্যে যতটুকু ভাল দেখি, তার থেকে ততটুকুই গ্রহণ করি। কা(র মধ্যে যদি একনিষ্ঠতা একাগ্রতা সাহসিকতা দেখি, সে যে দলেরই হোক, আমার তাদের ভাল লাগে (আমি তাদের কথা বলি। কোন কোন গুণের জন্য সি, পি, এম-দের আমার ভাল লাগে। আবার কোন কোন গুণের জন্য নকশালদেরও ভাল লাগে। তেমনি আবার তাদের মধ্যে দোষত্রুটি দেখলে বলতেও ছাড়ি না। সহজভাবেই সেগুলোর সমালোচনা করে যাই। কিন্তু নিন্দা করার উদ্দেশ্যে কিছু বলি না। প্রত্যেক সংগঠনই যাতে নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারে, সেই শুভচিন্তা করেই সমালোচনা করি।

সি, পি, এম (সি, পি, আই—এদের ক্যাডারদের আমার ভাল লাগে। তাদের কর্মদ(তা, দলের প্রতি নিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। তারা আছে বলে আজও সমাজ কিছুটা টিকে আছে (নইলে দুর্নীতি একে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস ক'রত। আমার নিজের চোখে দেখা একজন সি, পি, এম ক্যাডার-এর কথা বলছি।—তার বাবা মারা গেছেন, তাঁকে (্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমন সময় একটি বিশেষ কাজে ছেলেটির ডাক পড়ল। পিতার মুখে আগুনটুকু দিয়েই সে চলে গেল তার পার্টির ডিউটিতে। চিন্তা করে দেখ, এখানে সে তার ব্যক্তি(গত সুখ-দুঃখকে বিসর্জন দিয়ে দলের ডাকে তো সাড়া দিয়েছে! এটা কম কথা নয়! এদের প্রতিটি ক্যাডারই এই রকম একনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ। তাদের এই নিষ্ঠার, এই একাগ্রতার, ঝড় জল উপে(া করে খুশীতে কাজ করে যাওয়ার উৎসাহকে কেন প্রশংসা করবো না? এখন, বৃহৎ কাজে যেমন ছোট-খাট ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ই, তেমনি সংগঠন বৃহৎ হলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চাপ কিছুটা সহ্য করতে হয় বৈকী। সি, পি, এম-এর সংগঠন অনেক বড়। দু'একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি(যে তাতে একেবারেই নেই তা নয়। তাদের চাপে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেটা নিয়ে যত হৈচৈ করবে, সমস্যা ততই বেড়ে যাবে। সুতরাং ওগুলো নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নেওয়াই ভাল।

একবার একটা গ্রামে বরযাত্রী গেছিলাম। বর যাচ্ছে একটা বিরাট হাতিতে চড়ে, হাতি যেদিক দিয়ে যায়, সেদিকের সড়ক কিছুটা ভাঙ্গে, (ে(ত কিছুটা নষ্ট হয়। তাই দেখে গ্রামের আশপাশের লোকজন হৈ হৈ করে লাঠি সোটা, ঠ্যাঙ্গা নিয়ে বরযাত্রীদের মারতে আসে। তাই দেখে হাতি বিচলিত হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। তাতে (ে(ত আরও বেশী নষ্ট হয়, সড়ক আরও বেশী ভাঙ্গে। যত (ে(ত নষ্ট হয়, ততই গ্রামের লোক রেগে গিয়ে বরযাত্রীদের দিকে তেড়ে আসে। উভয়প(েই মারামারি বেধে যায়। ফলে গ্রামবাসীদের ফসল নষ্ট হয় (বরযাত্রীদের সময় নষ্ট হয়। তখন আমি গিয়ে গ্রামবাসীদের বললাম—অযথা আমাদের উপর দোষারোপ করছ কেন? হাতি তো আর ইচ্ছা করে (ে(ত নষ্ট করছে না! মাহুতও করাচ্ছে না। গন্তব্যে পৌঁছানর পথ যখন একটা, তখন ঐ আলের পথে যেতেই হবে। তা ছাড়া হাতির শরীরটার চাপে কিছু ফসল নষ্ট হবেই। ঐটুকু (তি যদি সহ্য করা না যায়, তবে কিন্তু বিরাট (তিরই সম্ভাবনা। গ্রামের লোককে যখন এই কথা বুঝিয়ে দেওয়া হলো, তারা যখন বুঝল, এ (তি হাতি, মাহুত বা বরযাত্রীদের ইচ্ছাকৃত নয়, তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মিটল (যে যার নির্দিষ্ট পথে চলে গেল। এই রকম ভুল বোঝাবুঝি থেকেই অযথা অপবাদ নিতে হয়। আর তার থেকে গৃহবিবাদ বাধে। সেটাকে বড় করে দেখলেও চলেনা। আবার তা নিয়ে বসে থাকলেও চলেনা। ওগুলো নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

নকশালদের দ্বারাও এইরকম কিছুটা (তি হলেও, তাদের মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে, যা সত্যই প্রশংসনীয়। কত ভাল ভাল ছেলে-মেয়েরা, নিজেদের কথা চিন্তা না করে, স্বার্থকে বর্জন করে যেভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছে, মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে যেভাবে তারা এগিয়ে আসছে, তা উপে(া করা চলে না। তাদের দুর্জয় সাহস, নির্ভিকতা, বনে-জঙ্গলে-গুহায় দিনের পর দিন অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়ে দেওয়ার (মতাকে বাহদুরী না দিয়ে পারা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আমার ভিয়েতনামীদের কথাও স্মরণ হচ্ছে। তারাও শুনেছি, ঘরে ঘরে স্ত্রী-পু(ষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে একবাক্যে দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছে। তারা জগতের সামনে যে দৃষ্টান্ত, যে আদর্শ তুলে ধরেছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে আজ যারাই দেশের কাজে এগিয়ে আসবে, জনগণের মঙ্গল কামনায় কাজে নামবে, আমি তাদেরই সমর্থন ক'রব। তারা যে দলেরই হোক, আমি মনে প্রাণে কামনা ক'রব—তারা বন্যার জলের মত অজস্র ধারায় বয়ে আসুক। ঢেউয়ের আঘাতে সমস্ত অন্যায়-অসত্যের ইমারতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিক। স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাক সমস্ত অবিচার, অত্যাচার, আর কুসংস্কারের আবর্জনা। তারপর তাদের গতিপথে ফেলে যাওয়া পলিমাটিতে নতুন করে গড়ে উঠুক ন্যায়ের রাজ্য। একাজ যারা পারবে, তারা যে প(েরই হোক, যত বড় শত্রুই হোক, তাদের সে কাজের প্রশংসা করার, তাদের সে গুণের আদর করার হিম্মত আমি সব সময় রাখি। যাদের সে হিম্মত নেই, আমি তাদের কাপু(ষ বলে মনে করি। আমি আর যে প(েরই হই, কাপু(ষের প(ে হতে রাজী নই।

প্র(্ন ঃ আপনি তিনটি পার্টির কথা প্রায়ই বলেন। সেগুলি ছাড়া আর যে সমস্ত পার্টি আছে—যেমন ধ(ন কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি, তাদের সম্বন্ধে তো কখনও কিছু বলেন না! এদের সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ তোমরা যা জিজ্ঞাসা কর, তারই উত্তর দি। ওদের কথা জিজ্ঞাসা করনা, তাই বলি না। তাছাড়া ভাললাগা বা মন্দলাগা, সমর্থন করা বা না-করা, সব কিছুই নির্ভর করে কাজ ও তার ফল দেখার উপর। ফলের দ্বারাই গাছের পরিচয়। তারাও দেশের শান্তির জন্যই খাটছে। এখন গরজ কার কতটুকু আছে, ফল দেখেই বোঝা যাবে।

প্র(্ন ঃ আপনার এখানে তো সবরকম লোকই আসা-যাওয়া করে।

আপনি বলে-কয়ে সকলের মধ্যে একটা মিটমাট করে দিলেই তো পারেন।

উত্তর ঃ ঠিকই বলেছ। আমার এখানে সর্বদলের সর্বপ্রকার লোকই আসে। কিন্তু আমি নিজে থেকে কখনও কা(র ব্যক্তি(গত বা দলগত মতামত নিয়ে আলোচনা করিনা। সাধারণতঃ আমি বেদ নিয়ে আলোচনা করি। বেদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা সবাইকে জানাই। বেদ বলছে, নিজে শুধু সৎ হলেই চলবে না—অসৎ কিছু যেখানে দেখবে, সেখানেই আঘাত হানবে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান সমাজের প্রতিটি স্তরের অসাধুতার কথা ওঠে। বেদ থেকেই সমাজ সংস্কারের পথ ও পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করে, কিভাবে সমাজের এই ক্লেদগুলো দূর করা যায় এবং সমাজকে দোষমুক্ত(করে দেশের ও দশের উন্নতি করা যায়—সে কথা বলি।

সমাজ সংস্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ তাদের পার্টির কথা জানায়, তাদের আদর্শগত বিরোধের কথা জানায়। আমি বলি, যেখানে বিরোধ, সেখানে আর আদর্শ রইল কোথায়? আদর্শের ফল যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তবে সেটা আদর্শের দৃষ্টান্তে পড়ে না। আদর্শ হবে এক। এক নীতির বাঁধুনিতে না থাকলেই যত বিবাদ, যত ঝঞ্ঝাট। নীতি বা আদর্শ যদি ব্যক্তি(গত হয়, তবেই গণ্ডগোল। আজকের দিনে এটাই হচ্ছে। শুধু রাজনীতিক (ে ত্রে নয়, সকল (ে ত্রেই। সর্বধর্মসমন্বয়ের জন্য বি(ধর্ম সম্মেলন হচ্ছে। সেখানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছে একজন, আর একজন ইস্‌লাম ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। যে মুহূর্তে সে বলছে, 'আমি হিন্দুধর্মের রিপ্রেসেন্‌টেটিভ' সেই মুহূর্তেই সে নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সকলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে। বেদের যে ধর্ম, তা হিন্দু ধর্মও নয়, মুসলমান ধর্মও নয়। সেটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম অর্থাৎ নিত্যধর্ম—যা প্রথম থেকে আছে, শেষ পর্যন্ত থাকবে। এই সনাতন ধর্ম হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম। জীবজগতের প্রতিটি জীবের যা ধর্ম, সেটাই সনাতন ধর্ম। —আমি শুধু এ কথার পুন(ক্তি(করতে এসেছি।

বর্তমানের পার্টিগুলোরও সেই একই অবস্থা। তারা আদর্শকে ব্যাপ্তিতে ছেড়ে না দিয়ে ব্যক্তি(তে সীমাবদ্ধ করে রাখছে। আর তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। তাই পরিণতিতে এত মারামারি, কাটাকাটি! সাগর তো একই। 'পুরীর সাগর' আর 'মাদ্রাজের সাগর' বলে যত চিৎকার করবে, গৃহবিবাদ ততই মারাত্মক হয়ে উঠবে। সুতরাং এ সব ভুল বোঝাবুঝি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নিয়ে এক হয়ে যাওয়াই শ্রেয়। সকলেই যখন সাম্যবাদে বি(াসী, তখন এক না হওয়ার তো কোন কারণ দেখিনা! গোত্র, গুষ্টি তো সকলের একই। সবাই সাম্যবাদী।

সুতরাং মিলতে কত(ণ? আমার কি মনে হয় জান? এই যে সমস্ত দল—এরা সবাই চিল্কা হ্রদের মত। এরা সাগরই। সমূহ সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই বিচ্ছিন্নতা নষ্ট হয় কর্তনের দ্বারা। সেটা হলো Sacrifice (ত্যাগ)। আজকের দিনে তারই অভাব। নিজেদের চারিদিকে যে আত্মম্ভরিতার কঠিন চড়গুলো আছে, ত্যাগের দ্বারা সেগুলো কর্তন কর—বিসর্জন দাও। দেখবে সব এক হয়ে যাবে, সাম্যের সাগরে মিলিত হবে। সাম্যের সুরের সঙ্গে connection এর (যোগাযোগের) অভাবে যে সঙ্কীর্ণতাগুলো ছিল, এক মুহূর্তে সে সব দূর হয়ে যাবে। সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আজকের দিনে সকলের মধ্যে যে সংঘর্ষ, সেটা গৃহবিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ গৃহবিবাদ মিটান নিজেদেরই হাতে। আজ কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। একদল আর একদলকে গালাগাল দিচ্ছে। এরকম যদি চলতেই থাকে, তবে তো উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগে নিজেরাই মারামারি করে মরে শেষ হয়ে যাবে। কাজ হবে কবে? একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্ন মেম্বারদের মধ্যে মাঝে মাঝে ভুল বোঝাবুঝি, তর্কাতর্কি হয়, সেটা ঠিক। কিন্তু সেটাকে ধরে নিয়ে বসে থাকলে তো চলে না। তা কেউ থাকেও না। নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে মিটিয়ে নেয়। তা সত্ত্বেও কেউ যদি অবুঝপানা করে, তখন তার ওষুধও আছে। ছাগ, গাভীকে অনুনয় বিনয় করে যদি ঘরমুখী না করা যায়, তখন পাচনের বাড়ি দিতে হবে।

আজ আমাদের অবস্থা কেমন হয়েছে জান? এক মায়ের চার সন্তান। চারদিকে মুখ করে বসে আছে। অথচ সবাই মাকে ভালবাসে। মায়ের সেবা করতে চায়। মায়ের অবস্থা শোচনীয়। সেতো মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। একজনকে ডাক দিলে আর একজন মুখ ভার করে। ভাবে—আমায় বুঝি মা ভালবাসে না। মাকে যখন সবাই চায় এবং মা যখন সবাইকে চায়, তখন নিজেদের আত্মাভিমানগুলো ঝেড়ে ফেলে চার মুখ একদিকে করে বসলেই তো সব গোল চুকে যায়। আমার মনে হয় এখানকার বিভিন্ন দলগুলো আজ যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি বিমুখ, তার কারণই ভুল বুঝাবুঝি। একদিন না একদিন সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একমুখী হবেই। সকলের উদ্দেশ্য যখন এক, সকলেই যখন বিপ-বে বি(াসী, সমূহ এদের মত ও পথ নিয়ে বৈষম্য বিবাদ বেধেছে, আমার ধারণা পরিশেষে এটা থাকবে না। বিপদ বুঝলেই সব দল 'এক দল' হয়ে যাবে। দেখ নি, বন্যা, ভূমিকম্প বা যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সামাজিক বিপদের সময় সাপ, ব্যাঙ, মানুষ সব নিজেদের শত্রুতা ভুলে এক জায়গায় এসে আশ্রয় নেয়, একত্রে বাস করে! চারিদিকের সমস্যায় অবস্থা যেমন ত্র(মশঃই জটিলতার দিকে যাচ্ছে, তাতে সব পার্টি একত্র হবেই। বিপর্যয়ই মিলনের ইঙ্গিত।

প্র(ঃ আপনি যে আদি বেদের কথা বলেন সেই বেদের রচয়িতা কে? কি ভাষায় তা লিখিত?

উত্তর ঃ আদি বেদ নয়, আমি বলি অনাদি বেদের কথা। জগৎ সৃষ্টির মত সেই বেদও সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশ থেকে। জীব জগতের জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির নিয়মে, প্রয়োজনমত সব কিছু এই মহাকাশ থেকেই আসছে। বেদের সৃষ্টিও সেইভাবেই। মহাকাশ হচ্ছে জ্ঞানের আধার। বেদই হচ্ছে জ্ঞান। সুতরাং বেদ মহাকাশেই আছে। আবার মহাকাশই বেদ। ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিরা গবেষণার দ্বারা সেই মহাকাশের মহাজ্ঞানের পাঠ কিছুটা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে স(ম হয়েছিলেন বলেই তাঁদের বলা হতো বেদজ্ঞ, অর্থাৎ বেদকে যাঁরা জ্ঞাত হয়েছিলেন।

জীবজগতে কত বিচিত্র, কত সহস্র সহস্র বিষয়বস্তু আছে। প্রত্যেকের জীবন ধারণের উপযুক্ত(ব্যবস্থাও সাথে সাথে আছে। এই ব্যবস্থাগুলোর দিকে তাকিয়ে যদি চিন্তা করা যায়, তবে স্পষ্ট মনে হয়, কে যেন বুঝে বুঝে প্রয়োজনমত ও সময়মত সব কিছু পাঠাচ্ছে। কে পাঠাচ্ছে, কিভাবে আসছে, কোথা থেকে আসছে, সে সব কথা এখন চিন্তা করার প্রয়োজন

নেই। এগুলো রহস্যের মধ্যেই থাক। তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি(যখন আছে, সেই সীমার মধ্যে যতটুকু আসে তারই পথ ধরে ধরে চিন্তা করে যাও। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকেই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যাও। দেখ মূলে কি আছে? তবেই বুঝতে পারবে অনন্ত বি(ের মূল কি? বেদ কি? কে তার স্রষ্টা? প্রথমেই একটা না বুঝে ধরে নেওয়ার দরকার কি?

এই যে এত বড় আকাশ, শুধু চোখে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় সম্পূর্ণই ফাঁকা (তার মধ্যে তো কত গ্রহ, উপগ্রহ, অণু-পরমাণু (তার চেয়েও কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তু শৃঙ্খলার সঙ্গে আপন আপন গতিপথ পরিত্র(মণ করে চলেছে। বহু অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে কত কিছুর automatic production (আপনা আপনি সৃষ্টি) হয়ে যাচ্ছে। মেসিনের মত এই ফাঁকার ফ্যাক্টরীতে কাজ হয়ে যাচ্ছে। এই যে ফাঁকা থেকে সৃষ্ট বস্তুগুলি, একে ব্যবহারিক (ে ত্রে চেতন, অচেতন যে নামেই অভিহিত করনা কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সেটা তো একটা ব্যবহারিক ভাষা মাত্র। আমাদের চিন্তা করতে হবে, আকাশ থেকে সৃষ্ট বস্তুগুলোর স্বরূপটা কি? এই সৃষ্ট বস্তুগুলো ফাঁকারই একটা রূপ বিশেষ। কারণ বস্তুর যে কোন দিক বি(-ষণ করতে গেলে ফাঁকা ছাড়া কিছুই মেলে না। যে যে গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি বস্তু, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যেগুলো অনুভব করছি, খুঁজতে গেলে তার একটা গুণও আমরা খুঁজে পাইনা। এই যে কি সুন্দর ফুল, চোখের সামনে তার সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি, ঘ্রাণ দিয়ে তার গন্ধ পাচ্ছি, হাতে স্পর্শ করে তার কোমলতা অনুভব করছি। কিন্তু খুঁজতে গেলে কোনটাই পাওয়া যায় না। সবটাই ফাঁকা।

জীবকে বি(-ষণ করতে গেলে রক্ত(, মাংস, অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। আবার তাকেও যদি বি(-ষণ কর, তবে আরও সূক্ষ্মে চলে যেতে হয়। রক্ত(কোথা থেকে এলো? খাদ্য থেকে। খাদ্য কোথা থেকে এলো? উদ্ভিদ থেকে। উদ্ভিদ এসেছে মাটি, জল, আলো, হাওয়া থেকে। আবার এই মাটি, জল, হাওয়া সকলেরই উদ্ভব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর সমন্বয়ে, যা আকাশেই বিদ্যমান। সুতরাং দেখছ, জীবের শিরায় শিরায় যে রক্তে(র ধারা, তা কোন অদৃশ্য পথ ধরে আকাশ থেকেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এইভাবে অস্থি, মজ্জা, ত্বক, সব কিছুকে ধরে ধরে বি(-ষণের পথে এগিয়ে যাও। দেখবে সব কিছুই ফাঁকায় বা আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাতেই বোঝা যায় ফাঁকা থেকে সব কিছু সৃষ্টি, ফাঁকাতেই সব কিছু আশ্রয় নিয়ে আছে, আবার ফাঁকাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, সব কিছুই আকাশে। আকাশকে আশ্রয় করে, আকাশের গতির সাথে মিলিয়ে বি(ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু আবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই আকাশের প্রতি অণুতে পরমাণুতে আকাশেরই বর্ণনা। বাস্তবের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আকাশেরই প্রকৃতি নিহিত। তাদেরই মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় আকাশের বৈশিষ্ট্য। আকাশ ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। কিন্তু বস্তুকে ধরতে পারি। তার মধ্য দিয়েই আকাশকে ধরা, বোঝা যায়। তাকে চেনার মত যা কিছু, বস্তুকে কেন্দ্র করেই পাওয়া যায়। প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই আকাশের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। এই যে বর্ণনা, তাহাই বেদ। এই বেদের প্রতিটি ছন্দ, প্রতিটি ছত্র যদি ভালভাবে পাঠ করা যায়, তবে বুঝতে পারবে, জীবের প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন সব কিছু আপনা থেকে আসছে, তেমনি কিভাবে চলা দরকার, কি ভাবে চললে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে যাবে, এবং কিভাবে বি(েরহস্যকে অবগত হওয়া যায়, তারও আদেশ, নির্দেশ ও ইঙ্গিত নানাভাবে, নানা দিক থেকে দিয়ে যাচ্ছে।

এই যে জীবজগতের বহু জীব, নিরী(ণ করলে দেখবে তাদের ভেতরে বহু ভাব, বহু স্বভাব, বহু রকম আচার ব্যবহার। এগুলিই প্রকৃতির নির্দেশ আকারে প্রত্যেকের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এগুলো বুঝে নিতে হবে। প্রত্যেকের এক একটি নিজস্ব চাল-চলন আছে। তাদের প্রত্যেকের খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা, আদান-প্রদান, স্বভাব বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ঠিকমত পাঠ করা যায়, এবং যুক্তি(ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সেগুলিকেই যদি আমাদের দৈনন্দিন চলার পথে প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োগ করা যায়, তবেই দেখবে জীবন কত সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সহজ ও সুন্দর জীবনই উন্নত জীবন। সুতরাং জীবনকে উন্নত করতে হলে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ কর। ওটাই বড় গ্রন্থ। ওটাই প্রকৃত শি(া। এই যে বিরাট প্রকৃতির গ্রন্থ উন্মুক্ত(হয়ে পড়ে আছে, তাহাই বেদ। সেই বেদ পাঠ কর, দেখবে, তোমার জীবনের পথ-পাথেয় সব পেয়ে যাবে।

সহস্র সহস্র বছর আগে সেই সব চিন্তাশীল ব্যক্তি(—যাঁদের মুনি, ঋষি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁরা এই প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ ও তার রহস্য উদ্ধারের গবেষণায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। তাকেই বলা হতো সাধনা। হয়তো একশ বছর সাধনা করে তাঁরা সেই বিরাট গ্রন্থের অগণিত পৃষ্ঠার যেটুকু পাঠ উদ্ধার করতে পারলেন, সেটুকু মুখে মুখে তাঁদের উত্তরপু(ষকে কয়েক বছরে শিখিয়ে দিলেন এবং বলে গেলেন, "এ গ্রন্থ বিরাট—এ রহস্য অনন্ত, আমরা আর কতটুকুইবা তোমাদের দিতে পেরেছি! তোমরা নিজেরা further study করে যাও। তার পাঠ উদ্ধার করার জন্য আরও সাধনা কর।" এঁরা তখন যা পেলেন, তার পর থেকে আবার প্রকৃতির গ্রন্থের নতুন অধ্যায়ের পাঠে মগ্ন হলেন। তাঁদের একশ বছর জীবৎকালের মধ্যে সাধনা ও গবেষণার দ্বারা তাঁরা আরও কিছু নতুন তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করলেন। একশ বছরের সাধনায় তাঁরা কিন্তু দুশ' বছরের সাধনার ফল পেয়ে গেলেন। এই দুশ' বছরের মিলিত সাধনার ফলকে তাঁরা আবার তাঁদের উত্তরপু(ষকে মুখে মুখে শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন "তোমরা আবার নিজেরা গবেষণায় রত হও।" এরা আবার একশ' বছর সাধনা করে আরও নতুন তথ্য উদ্ধার করল। এবার তারা একশ' বছরে তিনশ' বছরের সাধনার ফল পেয়ে যাচ্ছে। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, পু(ষ পরম্পরায় প্রকৃতির গ্রন্থ অর্থাৎ বেদের কিছু কিছু অংশ মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। তারপর আরও বহুশতাব্দীর পর যখন লিপির উদ্ভব হ'ল, তখন সত্যবতীর পুত্র ব্যাসদেব একে লিখিত রূপ দিলেন। এই সত্যবতী কে, কে এই ব্যাসদেব, সে কথা আমি পূর্বেও বলেছি। (ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪)। এই যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন মুনি, ঋষি, ব্যাসদেব ইত্যাদি, এঁরা কেউই বেদের রচয়িতা নন, প্রকাশকও নন। এঁরা বেদের বাণীর প্রচারক মাত্র। বেদ আপনা থেকেই রচিত, আপনা থেকে স্ফুরিত, আপনিই প্রকাশিত, আপনাতেই আপনি বিকশিত। এখনও সেই অনাদি, অনন্ত বেদের অগণিত পৃষ্ঠা অপঠিতই আছে। বহু যুগের বহু মনীষীর সাধনা ও গবেষণার ফলে যেটুকু আবিষ্কৃত হয়েছে, তা' মহাসাগরের তুলনায় এক বিন্দু বারি মাত্র। আজ তাও আবার বিশুদ্ধ নেই। চত্র(ান্তকারীদের চত্র(ান্তে সেই তৃষ(ার বারি দূষিত হয়ে গেছে। সেটাই বড় দুঃখের।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে—কিন্তু আমরা?

—ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী

প্র্ন ঃ আমি আপনার কাছে আজ নতুন এসেছি। শুনেছি, আপনি নাকি নেতাজী সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন। আমি এ সম্বন্ধে জানতে খুবই উৎসুক। তিনি কি সত্যিই জীবিত আছেন?

উত্তর ঃ তোমার প্র্নের উত্তর প্র্নেই দিচ্ছি। তোমার পূর্বপু(ষ যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা আছেন কি নেই, তা নিয়ে তোমার মনে কি কখনও প্র্ন জেগেছে, না, তাদের নিয়ে তুমি কখনও মাথা ঘামাও? অন্যান্য দেশনেতারা, যেমন ধর গান্ধীজী, নেহে(জী ইত্যাদি, তাঁদের মৃত্যু নিয়ে দেশবাসীর মনে কি কখনও এমন সংশয় জেগেছে—তাঁরা কি সত্যিই মারা গেছেন? এরকম প্র্ন কি কখনও কা(র মনে উঠেছে? তা যদি না উঠে থাকে, তবে নেতাজীর বেলায় উঠলো কেন? যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের জন্মদিন, মৃত্যুদিন নিয়মিত পালিত হচ্ছে। কিন্তু নেতাজীর বেলায় উল্টো দেখা যাচ্ছে—শুধু জন্মদিনটাই পালিত হচ্ছে। তিনি তো ভারতের অন্যান্য নেতাদের চেয়ে কম নন! তবে তাঁর বেলায় এ ব্যতিত্র(ম ঘটল কেন? সত্যিই যদি কা(র মৃত্যু ঘটে থাকে, তবে তার আত্মীয়-স্বজন যত দূরদেশে বসে সে সংবাদ পাক না কেন, কেউ তা অবি্নাস করবে না (এ নিয়ে মনে কোন দ্বন্দ্বও দেখা দেবে না। আবার তাদের বি্নাস উৎপাদনের জন্য মৃত ব্যত্তি(র চিতাভস্ম, অস্থি নিয়ে তাদের কেউ দেখাতেও আসবে না। যদি তা আসে, তবেই বুঝতে হবে, এ সংবাদের মধ্যে কোন রহস্য আছে। তাই নয় কি?

প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ সবার কাছে এসে পৌঁছেছে, অথচ আশ্চর্য, একটি ব্যত্তি(ও তা মনেপ্রাণে বি্নাস করেনি। কত সময় কত প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। নাম-ধামসহ এতজন মারা গেছে—বলে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই dead body পাওয়া যায় না। অনেককে আবার সনাত্ত(করাও যায় না। অথচ তাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তো কা(র মনে কোন সংশয় জাগে না? যিনি মারা গেছেন বলে প্রকাশ, তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে এই যে সংশয়হীনতা, এটাই তাঁর মারা যাওয়ার প্রমাণ। শত যুত্তি(, শত প্রমাণ দেখান সত্ত্বেও নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে সংশয়হীন আজ পর্যন্ত কেউই হতে পারেনি। সকলের মনেই সন্দেহের ছায়া। কোথায় তাঁকে রাখা হলো? কোথায় তাঁর শবদাহ হলো? ... ইত্যাদি। এমন কি যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল, সেখানকার স্থানীয় লোক যাঁরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও বলেছেন, এটা একটা মিথ্যা রটনা। এমন যে রটনা করা হবে, সেরকম একটা পরিকল্পনাও আগে থেকেই করা হচ্ছিল। অবশ্য সে পরিকল্পনা কে করেছিল, নেতাজী নিজেই, না বিপ(—সেটাও একটা প্র্ন। প্রয়োজনবোধে নেতাজী নিজেও এরকম একটা ঘটনার রটনা করতে পারেন না, তা নয়—সবাই জানলো—বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে (কেউই, বিশেষ করে শত্রুপ(তাঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। লোকচ(ুর আড়ালে থেকে তাঁর প(ে কাজ করার সুবিধা হবে, এই মনে করে তিনি নিজেও এ পরিকল্পনা করতে পারেন। শত্রুপ(ের এবং তৎকালীন দেশের অন্যান্য নেতাদের মনোযোগ বিশেষ করে তাঁর উপর এসে পড়লে, তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বহু বাধার সৃষ্টি হতে পারে, তাঁকেও বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে—এই সব মনে করে বিপ(কে stunt (চমক) দেওয়ার জন্যই একাজ করা হয়েছিল। আমার ধারণা—বৃহৎ কাজের জন্য নেতাজীকে র(া করার প্রয়োজনবোধেই এই কাজ করা হয়েছিল। কে বা কারা করেছিল, নেতাজী নিজে, না অন্য কেউ (অন্য কেউ যদি হয়ে থাকে, তবে তারা বিদেশী না স্বদেশ থেকেই এ suggestion গিয়েছিল, সে আলোচনা করার এখন আর প্রয়োজন নেই। কাজের প্রয়োজনে যা করা হয়েছিল—হয়েছিল, কিন্তু কার্যসিদ্ধির পর এখন তাঁকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না কেন—এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

আজ আমাদের দেশ সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত। এই সঙ্কটমুহূর্তে দেশের হাল ধরার জন্যে নেতাজীর মত ব্যত্তি(রেই প্রয়োজন। আমাদের দেশবাসীর মন যে কোথায় নেমেছে, সেটা প্রমাণিত হচ্ছে তাঁকে ফিরিয়ে না আনার প্রচেষ্টা থেকে। তাঁর এতবড় ব্যত্তি(ত্বকে ঘরে বসে আজ অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। তিনি ফিরে এলে একচ্ছত্র রাজত্ব তাঁর হাতে চলে যাবে— সেটাই হয়েছে সবার হিংসার কারণ। মীরজাফরের রত্তে(র বীজ এখনও তো দেশের মাটি থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি! এখনও আমরা লোভ ছাড়তে পারিনি, লোভে সবই করতে পারি। একথা নেতাজী তখনই বুঝেলিলেন। তাই তাঁকে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনে হয় মৃত্যুর আড়াল সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই যে নেতাজীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তা নয়। তিনি সমগ্র এশিয়াকে একটি যুত্ত(শত্তি(তে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন সবাইকে এক সুরে বেঁধে রাখতে। প্রাচ্য দেশগুলির প্রত্যেকের স্বাধীনতা বজায় রেখে, তাদের সাম্যের নীতিতে বেঁধে এশিয়া-ব্লক গঠন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি ছিলেন বেদের পূজারী। বেদের অন্তর্নিহিত সাম্যবাদের সুর সদা-সর্বদা তাঁর কর্ণে ধ্বনিত হতো। সেই সুরই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন রাশিয়া-চীনের কমিউনিজ্‌ম-এর মধ্যে। যখন তিনি ভাবছেন, কিভাবে এদের একত্র বাঁধা যায়, কোন্ পদ্ধতিতে এদের এক করে এশিয়া-ব্লক তৈরী করা যায়, তখনই তিনি আবিষ্কার করলেন, এই তিন দেশের সাম্যবাদের সুর-বিস্তারে যতই ফারাক থাক, মূল সুরটি এদের এক। সেটি হচ্ছে আদি বেদের সুর। তিনি যেন এতদিনে প্রাণ ফিরে পেলেন। তখন তিনি বেদকে সম্বল করে, সেই সুরের সূত্রে সবাইকে এক বাঁধনে বাঁধতে চাইলেন। মত, পথ, ভাষা, ভাবনা যার যা থাকুক না কেন, ভিত্তি সবার সাম্যনীতি হোক এবং সেই সাম্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর সমগ্র এশিয়া-ব্লক প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই হয়ে উঠলো তাঁর কাম্য। তিনি সেই ভাবেই কাজ শু(করলেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ করার মুখেই তিনি দেখলেন, তাঁকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই বাধাগুলোকে এড়ানোর জন্যই হয়তো তাঁকে ঐ রকম একটা stunt দিতে হয়েছিল। অবশ্য এ

গোপনতা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত র(া করা যায়নি। পরে ফাঁস হয়ে গেছে।

এখনও নেতাজী সম্বন্ধে নানাদিক থেকে নানা রকম সংবাদ শোনা যাচ্ছে। অনেকেই অনেক জায়গায় তাঁর সা(াৎ পেয়েছে। গোপন রাখার একান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা গোপন থাকেনি। লোকপরম্পরায় এখানেও সে সংবাদ এসেছে। দেশবাসীর অধিকাংশই আজও নেতাজীকে ভালবাসে, তাঁকে চায়। ভারতবর্ষে তো কত নেতাই এলো, গেলো। এরকম একচ্ছত্র ভালবাসা আর কেউই পায়নি। শুধু ভারতবাসীই নয়, চীন, রাশিয়া নাগারাজ্যও আজ নেতাজী বলতে পাগল। প্রাণ দিয়ে তারা নেতাজীকে ভালবাসে। বিশেষ করে নাগারাজ্যের বাসিন্দারা তাঁকে যে শুধু ভালবাসে তা নয়, তাঁর নির্দেশমত কাজ করতেও ভালবাসে। এবং সেইভাবে তারা কাজ করছেও।

আজ রাশিয়া, চীন ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। শত্রু হিসাবেই যে তারা এগিয়ে আসছে, সে ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মানুষ চিরদিন বাঘকে শত্রু বলেই ভাবে। কিন্তু কখনও কখনও বাঘও দুধ খাইয়ে মানব শিশুকে বড় করে। এটাও সত্য। আজ চীন বা রাশিয়ার দিকে তাকালেই মনে হয়, এরা যেন আমাদের দেশকে গ্রাস করার জন্য এগিয়ে আসছে। ওটা তো বোঝার ভুলও হতে পারে। প্রকৃত নেতার নেতৃত্ব পেলে, শত্রুও বন্ধু হয়। (তি করার জন্য যারা পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়েছে, উপযুক্ত(নেতার মধ্যস্থতায় সে উদ্যত হাত মিলতেও দেরী হয় না। আমার মনে হয়, নেতাজীর স্পর্শ ওরা পেয়েছে। তাঁর সাথে দুইদেশই হাত মিলিয়েছে। সুতরাং ও দুই দেশের সঙ্গে এ দেশের মিল হতে আর দেরী হবে না। এটাই আমার ধারণা।

আমরা জীবনভোর শুধু সত্যাগ্রহই করেছি। কিন্তু সত্যে আগ্রহী হতে পারি নি। বুট দিয়ে যখন অন্যায় ভাবে আমাদের মাড়িয়ে গেছে, তখন অস্ত্রবিহীন হয়ে সে অন্যায় অত্যাচারকে সহ্য করেছি। শিশুবয়সের সে অভ্যাস এখনও আমাদের যায় নি। কিছুটা পেলেই আমরা খুশী। কিন্তু দেশের সুখশান্তির পথ এটা নয়। বিপ্-বই শান্তির প্রকৃত পথ ও পদ্ধতি। **রাশিয়া, চীন, হালে ভিয়েতনাম তারই দৃষ্টান্ত। নেতাজীও বিপ্-বে বিশ্বাসী। বাল্যকাল থেকেই তাঁর রক্তে(বিপ্-বের বীজ সুপ্ত ছিল।** প্রথম প্রথম চোখের সামনে যে আদর্শ দেখেছিলেন, তাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন, অহিংসার আফিম খাইয়ে খাইয়ে দেশকে ক্র(মশঃই নির্জীব করে ফেলা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মে(দণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ছে, তখন তিনি বুঝলেন, অহিংসার পথে স্বাধীনতা কোনদিনই আসবে না। **তাঁর ভেতরের সুপ্ত বিপ্-বের বীজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। তিনি বিপ্-বের পথ ধরলেন।** নিজের বুদ্ধি ও শক্তি(তে বিপ্-বে বিশ্বাসী দেশগুলির সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করে ভারতে স্বাধীনতালাভের পথ তৈরী করে নিতে তিনি সমর্থ হলেন। **ভারতের স্বাধীনতার মূলে নেতাজী ও হিটলারের দান অনেকখানি— একথা আমি বিশ্বাস করি।**

আজ হিটলারের অবস্থা নেতাজীরই মত। হিটলারের মৃত্যু নিয়েও অনেকের মনে অনেক দ্বন্দ্ব আছে। কিভাবে কোথায় তিনি মারা গেলেন, তা নিয়েও মতবিরোধ আছে। কোনটারই সত্যাসত্য প্রমাণিত হয় নি। আবার এও শোনা যায়, এখন নাকি তাঁরা দুজন একই স্থানে, একত্রে অবস্থান করছেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আমার এক এক সময় মনে হয়, সেদিন যেভাবে নেতাজী বিদেশীদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে তাদেরই সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, হয়তো আজও সেইভাবেই, একই পদ্ধতিতে এশিয়া-ব্লক তৈরী করার কাজে নেমেছেন। তিনিই যে ভারতের সীমারেখার বাইরে থেকে, — No-Man's Land-এর এদিক, ওদিক কোথাও থেকে বিপ্-বের নির্দেশ দিচ্ছেন না, তাই বা কে বলতে পারে? এমনও তো হতে পারে, আজকে চারিদিক থেকে যে সব বিপ্-বের ধ্বনি উঠছে, নতুন নতুন ধারা সৃষ্টি হচ্ছে, তার পেছনে একটা প্রখর শক্তি(শালী, তী(্ণ ধী ব্যক্তি(ত্ব কাজ করছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। এখন প্র(্ন— কে সেই ব্যক্তি(, যার ইঙ্গিতে আজ সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে? এ কোন খুচরো নেতার কাজ বলে তো মনে হয় না! তবে সেই কি নেতাজী?

আজ ভারতবর্ষের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বাতাস ভারী। অবস্থা ক্র(মশঃই গভীর ঘোরালো হয়ে আসছে। এরপরই হয়তো বর্ষণ শু(হবে। আকাশের কালো মেঘই ঝলকে ঝলকে বর্ষা আনে। দেশের ঘোলাটে পরিস্থিতি কি 'বর্শা'-র ফলকের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

একদিন আমাদের দেশে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেলেও দেশবাসীকে বিপ্-বের পথে নামান যায়নি (দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও দেশের অগণিত জনসাধারণের সকলকে সংগ্রামমুখী করা সম্ভব হয়নি। আর আজ কা(কে কিছু বলারও প্রয়োজন হচ্ছে না। পাড়ায় পাড়ায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সজাগ হয়ে উঠেছে। অন্যায়ের বি(দ্ধে (খে দাঁড়ানোর ইচ্ছা সকলের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। সবাই অপনা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ কার ইঙ্গিতে? কার নির্দেশে? অবশ্য বেদকে যদি ঠিক-ঠিক পাঠ করা যায়, তার প্রকৃত অর্থ যদি উপলব্ধি করা যায়, তবে নিজের ভেতর থেকেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার একটা ইচ্ছা জেগে উঠবে— উঠতে বাধ্য। এবং সেই ইচ্ছা থেকেই অন্যায়ের বি(দ্ধে (খে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা আসবেই। কারণ বেদ প্রতিনিয়ত সেই নির্দেশই দিয়ে চলেছে। নেতাজী বেদের বাণীকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকেই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন। আমার বি(্বাস এখনও তিনি সেই আদর্শকেই মনেপ্রাণে গেঁথে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আমার এ বি(্বাসকে তোমার মেনে নিতে যদি অসুবিধা না হয়, তবে তিনি আছেন বলেই ধরে নিতে পার।

প্র(্ন ঃ আছেন যদি তবে আসছেন না কেন? এখন যদি না আসেন, তবে আর কবেই বা আসবেন?

উত্তর ঃ তিনি কবে আসবেন—এটা অনেকেরই জিজ্ঞাসা। আমি যদি বলি— তিনি এসেছেন, তুমি বলবে— কই দেখছিনা তো! দেওয়াল ঘেরা বাগানের ফুল অনেকেই দেখে না, পাতার আড়ালে ম্যাগনোলিয়া অনেকের চোখেই পড়ে না। কিন্তু পাশ দিয়ে চলে গেলে তার গন্ধে ফুলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। তাছাড়া ফুলটি স্বয়ং কাছে না থাকলেও তার গন্ধেই কি অনেকটা তার আসার কাজ হয় না?

নেতাজী চান— তাঁর যা আদর্শ, সেটা দেশবাসীর মনে জেগে উঠুক। দেশবাসী সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে যাক। ব্যক্তি(র পূজা নেতাজী কোনদিনই ভালবাসেন না। তিনি চান কর্ম। হাততালি আর ফুলের মালা তিনি চান না, তিনি চান— তাঁর কর্মের ধারা দেশবাসীকে জাগরিত ক(ক, তাঁর আশা-আকাঙ্(া দেশবাসীর কাজের মধ্যে ফুটে

উঠুক। যারা তাঁকে চায়, তারা সেই কাজের মধ্যেই তাঁকে পাবে। তবুও হয়তো **অনেকেই চায়, তিনি সশরীরে উপস্থিত হোন। কিন্তু তারও একটা বিপদ আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে যে বিপদের আশঙ্কায় তাঁকে মৃত্যুর আড়াল রচনা করতে হয়েছিল, সেই একই আশঙ্কায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তিনি দেশে ফিরে আসতে পারছেন না, সশরীরে দেশবাসীর সামনে এসে দাঁড়াতে পারছেন না।** অথচ প্রতি মুহূর্তে তিনি ভারতের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলছেন আর পাগলের মত ছট্‌ফট্ করছেন। দেশবাসী আজ তাঁকে পাওয়ার জন্য যতটা ব্যাকুল, তার চেয়েও তিনি বেশী ব্যাকুল হয়েছেন দেশে ফিরে আসার জন্য। কিন্তু চাচা মীরজাফরের গুষ্টিতো আজও শেষ হয়নি! লোভ আমাদের এখনও ছেড়ে যায় নি। তাঁর ব্যক্তি(ত্ব, নেতৃত্ব এখনও আমরা সহ্য করতে পারছি না। আমরা ভালভাবেই জানি, আজ যদি তিনি উপস্থিত হন, তবে জনগণ একবাক্যে তাঁকে স্বীকার করে নেবে। সেই ঈর্ষাতেই হিংসা জাগছে, আর হিংসায় হিংসায় হিংস্রতা আরও জেগে উঠছে। তিনি এলেই যাতে তাঁকে শেষ করে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করে আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। একথা জেনে কে আর ফিরে আসতে চাইবে বল? মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আগেই যদি বিপদগুলো ঘাড়ে চেপে বসে, তবে তো কোন কাজই হবে না। **তাই একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, দেশের মাটির জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও তিনি দেশের মাটিকে স্পর্শ করতে পারছেন না।**

তাঁর ফিরে না আসার আরও কারণ আছে। সেটা দেশেরই জন্যে। তাঁকে নিয়ে কোটি কোটি লোক মেতে উঠুক, তা তিনি কোন দিনই চাননি। তাই যশ, মান, ভাললাগা, মন্দলাগা, ব্যক্তি(গত সুখ-দুঃখ, সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে তিনি দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যেই দেশ থেকে দূরে আছেন। দেশের জন্যেই দেশকে ছেড়েছেন। দৃষ্টি কিন্তু তাঁর ভারতেরই দিকে। ঝর্ণাধারার মত কর্মের ধারায় তিনি নিজেকে বইয়ে দিচ্ছেন দেশের মাটির দিকে। সেই ধারায় দেশ উর্বর হয়ে উঠুক, দেশবাসী কর্মে মুখর হয়ে উঠুক—এটাই তাঁর বর্তমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে তাঁর প্রচেষ্টা—তিন শক্তি(কে এক করে এক মহাশক্তি(সৃষ্টি করা, এশিয়া-ব্লক গঠন করা।

নেতাজী সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বলা যেতো। কিন্তু জানতো, 'সুভাষ-সুভাষ' করেছি বলেই আমাকে কত না নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে! তার জের এখনও চলেছে। বিদেশী রক্ত(র সংস্কারকে এখনও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তিনি যে জীবিত—সে প্রমাণের অভাব নেই। কোথায় আছেন—সে ঠিকানাও খোঁজ করলে পাওয়া যায়। একটু পরিশ্রম করলে সেখানে যাওয়া যায়। তাঁকে ফিরিয়ে আনাও এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়। কিন্তু সে চেষ্টা যে-করেছে, তাকেই 'পেরাসিনি' ভোগ করতে হয়েছে।—আমি নিজেই তার প্রমাণ। একবার সে চেষ্টা করেছিলাম। মনে হলো, যে ভাবে হোক তাকে এনে উপস্থিত করি, জনগণের এতদিনকার জিজ্ঞাসার সমাধান হয়ে যাক। কাজ শু(করলাম। অনেকদূর অগ্রসরও হলাম। অনেকের অনেক সাহায্যও পেলাম। কিন্তু বাধা পেলাম তার চেয়েও বেশী। শেষে ছলে বলে কৌশলে আমাকে অ্যারেষ্ট করা হলো—কেস বাধিয়ে ব্যস্ত রাখা হলো। এখন আর সে চেষ্টা করি না। মনে হয়—তিনি যেভাবে কাজ করছেন করে যান, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। ... সবটাই আমার ধারণা থেকে বললাম।

প্র(ঃ আমরা তো অনেকেই তাঁকে ভালবাসি। আমরা কি চেষ্টা করে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারি না?

উত্তর ঃ পারবে না কেন? কিন্তু তোমরা আর কয়জন? আমি কি কম লোক নিয়ে এ কাজ শু(করেছিলাম? সরকার যদি নীরব থাকে, সে যদি এদিকে নজর না দেয় তবে কিছুতেই সম্ভব নয়। সরকার ইচ্ছা করলে পারত। কোথায় দুটো বন্দুক আর চারটে বোমা, কতগুলো পটকা লুকান আছে, সেগুলো খুঁজে বার করা যাচ্ছে। আর একটা জলজ্যান্ত মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—এ কি বি(াসযোগ্য? আসলে তাঁর উপস্থিতিতে সকলকে আসন ছেড়ে দিতে হবে, তাঁর ব্যক্তি(ত্বের কাছে সকলকে মাথা নত করতে হবে—এটাই হয়েছে আশঙ্কার কারণ। জমিদার ফিরে আসুক—এটা কর্মচারীদের অনেকেই চাইছে না। জমিদারের অনুপস্থিতিতে নায়েব, গোমস্তা, আর্দালি সকলেই তার চেয়ারগুলোতে বসে পড়েছে। এমন সুন্দর গদি-আঁটা সোনার আসন পেয়েছে, তা ছেড়ে কেউই আর যেতে চায়না। এখন জমিদারের ফিরে আসার পথ বন্ধ না করলে চলবে কেন? তাই সব কর্মচারী জোট বেঁধে তার আসার পথ বন্ধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু তাই নয়, যারা চাইছে অরাজকতা বন্ধ হোক, জমিদার ফিরে আসুক, তাদেরও 'যেন তেন প্রকারেন' মাথা তুলতে দেওয়া হচ্ছে না! "যার কল্যাণে রামের মা, তারেই তুমি চিনলে না!"—রামকে দিলে বনবাস! যার জন্য দেশ স্বাধীন হলো, তারই দেশে স্থান হলো না। এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই।

প্র(ঃ দেশ তো আজ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সে স্বাধীনতাকে তো শুধু বাইরেই দেখতে পাচ্ছি। অন্তরে একে কবে উপলব্ধি করতে পারব?

উত্তর ঃ বাইরের বুঝ যেদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন যদি বোঝা যায়! চিতার আগুনে পুড়ে দেহের আর মনের অণুপরমাণুগুলো যখন আলোতে, মাটিতে, জলেতে মিলে মিশে এক হয়ে যাবে, আকাশ বাতাসের সঙ্গে যখন তারা একাত্ম হয়ে যাবে, তখনই স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝবে। অন্তরে স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে হলে, অন্তরের ও বাইরের—উভয়ের স্বাধীনতা থাকা দরকার। আমরা শুধু বাইরের স্বাধীনতাই পেয়েছি, অন্তরের স্বাধীনতার কথা শুধু মুখেই বলা হয়—সত্যিকারের পাইনি। তাই এখনকার স্বাধীনতা বুঝতে হলে, ধামা-ধরা নীতির পথ ধরতে হয়। আর তা যদি না পার, তবে ঐ বিশেষ কয়েকটা দিনেই শুধু মনে হবে—আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। যেদিন বাক্সের ভাঁজ করা জাতীয় পতাকাটি দড়ি দিয়ে টেনে উপরে তোলা হয়, কিম্বা ছাদে, মাঠে, ঘাটে জাতীয় সঙ্গীতের সুর তোলা হয়, সেদিনটাতেই শুধু আমাদের স্মরণে আসে—'আমরা না স্বাধীনতা পেয়েছি'! তখনই চলতে থাকে ছোট ছোট সভায় বড় বড় বক্তৃ(তা, বেতার-ভাষণ আর সারাদিনব্যাপী উৎসব। তারপর সে দিনটাও কেটে যায়, আমরাও ভুলে যাই যে আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে ঠিকই—কিন্তু আমরা কি পেলাম? দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, সমস্যা আর হাহাকার ছাড়া আর কি পেয়েছে ভারতবাসী? সত্যিই যদি আমরা অন্তরে বাইরে স্বাধীনতা পেতাম, তবে আমাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ধারা অন্যরকম হতো।—দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা থাকত

না। ভিতর ও বাহির, ঘর ও পর, স্বদেশ ও বিদেশ, সব এক হয়ে যেতো। যেদিন ঝাড়ুদার থেকে মিনিষ্টার পর্যন্ত সবাই সবাইকে মনেপ্রাণে এক বলে বুঝতে পারবে, গ্রহণ করবে, সেদিনই স্বাধীনতার স্বরূপ জানতে পারবে, স্বাধীনতার স্বাদ বুঝতে পারবে। শুধু বাইরের স্বাধীনতায় এ বুঝ সম্ভব নয়। বেদ বলছে—অন্তরকেও স্বাধীন করতে হবে, আয়ত্তে আনতে হবে। যে তা পেরেছে, অন্তরকে যে জয় করতে পেরেছে, স্ব-অধীনে আনতে পেরেছে, সেই প্রকৃত স্বাধীন, সেই প্রকৃত বীর। সেইরকম বীর স্বাধীন ব্যক্তি(ই আবার সবার মধ্যে, কি অন্তরে কি বাইরে, স্বাধীনতার ধারাকে সঞ্চারিত করতে পারে, স্বাধীনতাকে র(া করতে পারে। আজ দেশে সেই রকম ব্যক্তি(দুর্লভ। বেশীর ভাগই ধামাধরা। তাই স্বাধীনতা হাতে পেয়েও অন্তরে উপলব্ধি করা যাচ্ছে না।

প্রকৃতির দিকে যদি তাকিয়ে দেখ, যদি তাকে অন্তর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর, তবে বুঝতে পারবে—স্বাধীনতা কি? সেখানে মুক্ত(আকাশে প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ, ন(ত্র-তারকা, প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি জীবাণু এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অণু-পরমাণু প্রত্যেকেই স্বাধীনতার ঢেউয়ে দুলছে। তাদের আপন আপন গতিপথে তারা বিচরণ করে যাচ্ছে। কেউ কা(কে বাধা দিচ্ছে না। কেউ কা(র স্বাধীনতায় হস্ত(প করছে না, অথচ কোথাও কোন বিশৃঙ্খলা নেই, অনিয়ম নেই, অরাজকতাও নেই (সব কিছু কেমন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে।

জীবজগতেও প্রতিটি জীব সৃষ্টির দিক থেকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছে, তেমনি তাদের ভরণপোষণের জন্য কোনদিক থেকে কোনকিছুর অভাবও হচ্ছে না। প্রকৃতি মুক্ত(হস্তে অপর্যাপ্ত পরিমাণে আলো, বাতাস, জল, হাওয়া বিতরণ করে চলেছে। সেখানে প্রকৃতির যেমন কার্পণ্য নেই, তেমনি ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও কা(র মধ্যে বাগবিতণ্ডা, মনোমালিন্য, মারামারি, কাটাকাটি নেই। কেউ সেখানে বলছে না—এতটা সূর্য্যের আলো আমার, এই বর্ষার জলে তুমি ভাগ বসাতে পারবে না, কিম্বা ঐ আকাশে-বাতাসে আর কারও অধিকার নেই। খাদ্যের মত প্রকৃতির আলো, জল, বাতাসেরও যদি রেশন করা হতো, মানুষের হাতে পড়ে তাতেও যদি কন্ট্রোলের বেড়া দেওয়া হতো, তাদের পাওয়ার জন্য যদি সকলকে লাইন দিতে হতো, তবে আর দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকতো না!—খাদ্যের বেলায় আজ যা হয়েছে—শুধু সমস্যার পর সমস্যাই বাড়ছে, সুরাহা আর হচ্ছে না। কারণ মানুষের গড়া নিয়মে ফাঁক আছে, ফাঁকি আছে। প্রকৃতির নিয়মে কোন ফাঁকি নেই। সেখানে বি(ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর উপর সকলকার সম অধিকার। জল, আলো, হাওয়া, আকাশ-বাতাসকে উপভোগ করতে এখানে কোন দলাদলির অন্তরায় এসে বাধা দিতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ এসে তাকে কলুষিত করে নি। কোন কিছুই এসে তাদের স্বাধীন গতিকে রোধ করতে পারে নি, আজও পারছে না। কোনদিন পারবে বলেও মনে হয় না। কারণ তারা স্বগতিতে সজাগ ও বলীয়ান। তাই পৃথিবীর গর্ভজাত যারা, তারা পৃথিবীর বুকে থেকেই আত্মহারা। প্রতি মুহূর্তে তারা যেমন স্বাধীনতা উপভোগ করছে, তেমনি স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করছে।

প্রকৃতির এই যে ভাব, আমাদের মধ্যে তার অভাব বলেই আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েও তাকে উপলব্ধি করতে পারছি না, উপভোগও করতে পারছি না। আজ আমাদের গতির ধারা ভেজালমিশ্রিত, কলা-কৌশলে ভরা, কৃত্রিম। দলাদলি আর সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে পিচ্ছিল। তারই ফলে স্বাধীনতার স্ফুরণ দেশের সর্বত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। তা অন্তর ও বাহিরকে আলোকিত করতে পারছে না। ঘরের মাটির প্রদীপের মত খণ্ড আলো বিতরণ করেই তার আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আজকে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা সমগ্র জনসাধারণকে আদৌ, আলোকিত করতে পারে নি। (দ্র মশালের আলোর মত মুহূর্তে জ্বলে উঠে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্থানে সাময়িক আলো দিয়েই নিভে যাচ্ছে। সুতরাং একে আমরা স্বাধীনতা বলব কি করে? তাছাড়া আমরা যে অন্তরে স্বাধীনতা পাই নি, একথাও আমরা আজ মুক্ত(কণ্ঠে বলতে পারছি না। নানা আশঙ্কা ও চিন্তা এসে বাধা দিচ্ছে—যদি চাকরি যায়, যদি সরকারের বিষ-নজরে পড়তে হয় (সেই আতঙ্কে সবাই অন্তরে স্বাধীনতা উপলব্ধি না করলেও মুখে বলে যাচ্ছে—আমরা স্বাধীন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—বুকে টোকা দিয়ে বল, সত্যিই স্বাধীনতা পেয়েছ কিনা, কেউ তা বলতে পারবে না। কারণ সেকথা বললেও বিপদ।

বেদ বলছে—স্বাধীনতা হবে সূর্যের মত সদা দীপ্তিমান, স্বয়ংপ্রকাশ। তার স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে, সকল দিক আলোকিত হয়ে উঠবে। সূর্যের আলোককে যেমন সীমাবদ্ধ করা যায় না, স্বাধীনতা হবে তেমনি অসীম অবারিত। তার বিকাশ, তার প্রকাশ হবে সর্বত্র। ঘরে-বাইরে, দেশে-বিদেশে বহির্লোকে অন্তর্লোকে সর্বত্র তার স্পর্শ যখন ছড়িয়ে পড়বে, তখনই তাকে উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি প্রায়ই বলেন—'কিভাবে চললে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে যাবে, প্রকৃতিই তার ইঙ্গিত নানাভাবে, নানা দিক থেকে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা সে ইঙ্গিত বুঝে নিয়ে সেইভাবে চললে আমাদের আর কোন সমস্যা থাকবে না।'—প্রকৃতি কিভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং আমরাই বা সে ইঙ্গিত বুঝবো কি করে? সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

উত্তর ঃ যেভাবে তখনকার মুনি-ঋষিরা বুঝতেন, সেইভাবেই চেষ্টা করে প্রকৃতির ইঙ্গিত বুঝতে হবে। প্রকৃতির নিজস্ব বর্ণমালায় সবকিছু আকাশের পাতায় লেখা আছে। সেটা পড়ে নিতে হবে। সে বর্ণমালার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, সে-ভাষা যে বুঝতে পারে, তার প(প্রকৃতির ইঙ্গিত, তার ভাষা ধরতে পারা, বুঝতে পারা কিছুই কঠিন নয়। তখনকার দিনের চিন্তাশীলরা প্রথমে এই ভাষাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—জীবজগতের প্রতিটি বস্তু প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে প্রয়োজনের দ্বারা যুক্ত(। আদান-প্রদানের মধ্যেই জীবজগৎ টিকে আছে। আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, বনে-জঙ্গলে, সর্বত্র সবার ভেতরে, সবার সঙ্গে ছিল একটি ভাবের যোগাযোগ। ঐ ভাবটাই ছিল সবার মাতৃভাষা, আর ঐ যোগাযোগটাই হলো সবচেয়ে বড় যোগ। সেই ভাবের যোগের দ্বারাই তারা প্রকৃতির সাথে যুক্ত(হয়ে, একাত্ম হয়ে তার ইঙ্গিত পাঠ করে নিতো। তখন ছিল সকলের সঙ্গে সকলের প্রেম, ভালবাসা, মিত্রতা, আন্তরিকতার সম্পর্ক। কা(র সঙ্গে কা(র দ্বন্দ্ব ছিল না, হিংসা বিদ্বেষ ছিল না। ভালবাসার সম্পর্কে যুক্ত(ছিল বলেই একটু চেষ্টা করলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাবের ভাষা বুঝতে পারত। আজও দেখ, পালিত পশু পাখী, যাদের সঙ্গে একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যাদের নিয়ে আমরা একত্রে বাস করি, তাদের ভাব, চাল-চলন বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।—তখন তেমনই ছিল।

সকলের সঙ্গে ভালবাসার যোগযোগে যুক্ত(ছিল বলেই মুনি-ঋষিরা বুঝেছিলেন, বি(জগতে প্রতিটি জীবের প্রতিটি বস্তুর রূপের পার্থক্য যতই

থাক, স্বরূপে সকলে এক, সকলে একই জায়গার অধিবাসী। আবার প্রত্যেক জীবের মধ্যে, বস্তুর মধ্যে রূপে-রঙে পার্থক্য কেন? কেন সুরে, স্বরে, স্বভাবে পার্থক্য—এটাও তাঁরা বুঝেছিলেন। এই যে প্রত্যেকের আহারে-বিহারে, আচারে-আচরণে পার্থক্য বা ভিন্নতা, এগুলিই হচ্ছে প্রকৃতির গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণমালা। জানার সুবিধার জন্যই এই তারতম্য। এই বিভিন্ন বর্ণমালাগুলো জানতে পারলে প্রকৃতির প্রকৃত গ্রন্থ পাঠ করা সহজ হবে। তখনকার মুনি-ঋষিরা এগুলিই পাঠ করতেন। আজকালকার বইএর পাতায় বা বিভিন্ন অধ্যায়ে যেমন এক একটি বিষয়বস্তু লিখিত থাকে, তেমনি প্রকৃতির এক একটি বস্তুই হচ্ছে বেদের এক একটি অধ্যায়, সেই বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন তথ্য নিহিত আছে। সুতরাং বেদ কল্পনাপ্রসূতও নয়, অবাস্তবও নয়। সবই প্রকৃতিজাত, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তি(যুক্ত(ও বাস্তবভিত্তিক।

প্রাচীন মনীষীরা ছিলেন বি(-ষণমুখী। জীবজগতের প্রত্যেকের ভাব, মন, চিন্তা কার মধ্যে কতটা প্রভাবিত হচ্ছে, সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে, তাঁরা এক একজন এক একদিকে বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন। এইভাবে হাজার হাজার বছর ধরে গবেষণা করতে করতে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ—সবকিছু থেকে তাঁরা আকাশের বহু গুণ আবিষ্কার করলেন। এবং সে সমস্ত গুণগুলো ধরে রাখলেন। ঐ গুণগুলো বিচার করে, কোন্‌টা কতখানি কোন্‌কাজে লাগানো যায়, পরী(া করে প্রয়োজনমত সেগুলি ধরে ধরে কাজে লাগাতে লাগলেন। তাঁরা ল(্য করেছিলেন, অসুখে-বিসুখে ঔষধ খুঁজে বার করা অনেক পশুপাখীর সহজাত গুণ। এটাই প্রকৃতির একটা ভাষা। অনেক পর্যবে(ণের পর এই ভাষা যখন তাঁরা আয়ত্ত করলেন, তখন সেই ভাষার সাহায্যে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠে মগ্ন হলেন। তাঁরা হয়তো ল(্য করলেন, কোন পাখীর পা ভেঙ্গে গেছে, আর একটা পাখী মুখে করে একটা পাতা এনে কোন একটা লতার সাহায্যে সেটা তার পায়ে বেঁধে দিল। কিছুদিন পরই সে সুস্থ হয়ে উঠলো। চিন্তাশীল ব্যক্তি(রা পাখীর এই কার্যকলাপ ল(্য করে কি পাতা তারা ব্যবহার করল, কি পাতা তারা বাঁধল সেগুলি এনে তার দ্রব্যগুণ পরী(া করে নিজেরা ব্যবহার করে দেখলেন, সত্যিই সুফল দিচ্ছে। এইভাবে পর্যবে(ণ, পরী(ণ, নিরী(ণের দ্বারাই তাঁরা প্রকৃতির পাঠ উদ্ধার করতে স(ম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, আকাশে সব কিছু আছে। আকাশ নিজেকে পরিচিত করার জন্যই তার অগণিত অঙ্গুলির দ্বারা সব সময় ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—'এইভাবে চল'। প্রকৃতির কোটি কোটি জীব, কোটি কোটি বীজ আকাশের অঙ্গুলি স্বরূপ। সেই অঙ্গুলি যেন কলম ধরে লিখে জানিয়ে দিচ্ছে—'এইভাবে চল, এইভাবে বল।' প্রকৃতিদত্ত এই নির্দেশই হচ্ছে বেদ। সুতরাং বেদই সবকিছুকে উপলব্ধি করার জন্য ইঙ্গিত দিচ্ছে—সকলকে তত্ত্বমুখী করছে।

বেদের তত্ত্ব এবং জীবনের তত্ত্ব একই সুরে বাঁধা, সাধা, গাঁথা। সুতরাং জীবনকে উন্নত করতে হলে, সমাজকে সমৃদ্ধকরতে হলে বেদের তত্ত্বকেই প্রয়োগ করতে হবে। বি(েসমাজ গঠন করতে হলে আকাশের নির্দেশেই চলতে হবে। বীজ গৃহেই আছে। তাকে শুধু ে(ত্রে রোপণ কর। আকাশে, প্রকৃতিতে কোন কিছু অভাব নেই। যখন যা প্রয়োজন—খুঁজে দেখ ঠিক সেখানে পেয়ে যাবে। সেই প্রকৃতির নির্দেশে যদি আজ সকলে চলতে পারত, তবে অসুখ-বিসুখ, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা, ছল-চাতুরি, দুঃখ-দারিদ্র্য, ব্যথা বেদনা, রোগশোক কিছুই থাকত না। হয়তো অভিধানেই কেবল শব্দগুলোর উল্লেখ থাকতো, বাস্তবে কোন প্রয়োগ পাওয়া যেতো না। আজ যেমন 'বেদ কি?'—এ কথা তোমাদের এসে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতে হচ্ছে, তেমনি ঐসব কথাগুলোর অর্থ কি, এগুলো কাকে বলে, বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে বুঝে আসতে হতো। তোমরা যদি একটু চিন্তা কর—প্রকৃতির নীতিটাকে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই দেখবে, আদর্শ সমাজ গঠন করার জন্য যা কিছু দরকার—নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা সব কিছু প্রকৃতির প্রতি বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যে অপূর্ব মিলন, সেই মিলনের ধারায় ধারায়, ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলে সমস্ত সমস্যার সমাধানের দিকটা খুঁজে পাবে। বেদজ্ঞরা সেইভাবে অগ্রসর হয়ে সব কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সেই নীতিতে তখনকার সমাজ গড়েছিলেন বলেই তখন কোন সমস্যা ছিল না। সমাজ সবদিকে ভরপুর ছিল। সমাজপতিরা দিবারাত্র বি(েরহস্যের চিন্তায় ও বি(-ষণে মগ্ন থাকতেন, তার থেকে খুঁজে বার করতেন অমূল্য সম্পদ। সেগুলিকেই বাস্তবের কাজে লাগাতেন।

আজও আকাশ তার অগণিত অঙ্গুলির ইসারায় সমস্ত সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে। সেই ইঙ্গিত বুঝতে চেষ্টা কর। বেদবাণীকে সম্বল করে বি(েের জানার পথে এগিয়ে যাও। দেখবে, নিজে যেমন অপূর্ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে, তেমনি সমাজকেও প্রাণের মত করে গড়তে পারবে। শিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমস্ত কিছুর মূল জিনিস এখানে পেয়ে যাবে। একটা গাছকে ল(্য করে দেখ, সে যেন কবিতা হয়ে ফুটে বা'র হচ্ছে।—সেখানে তুমি কবিতার ছন্দের নির্দেশ পেয়ে যাবে। পাখীর বাসার দিকে তাকাও, সে যেন শিল্প হয়ে উঠেছে। কারিগরী বিদ্যার ইঙ্গিত সেখানে পাবে। মাটির তলায় ইঁদুর, খরগোস, পিপীলিকা ইত্যাদির গর্ত খননের ধারাটিকে ল(্য করলে বাণিজ্যিক শি(ার অপূর্ব পথনির্দেশ মিলে যাবে। কি অদ্ভুত কৌশলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তারা ভূগর্ভে এক স্থান থেকে আর একস্থানে চলে যাওয়ার পথ তৈরী করে রেখেছে! এক জায়গা থেকে খাদ্য এনে আর এক জায়গায় জমা করছে। এ সব ভাষা পাঠ করতে পারলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আমদানি, রপ্তানি, আদান-প্রদান, খাদ্য সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সবকিছু শিখতে পারা যায়। প্রকৃতি যেন শিখিয়ে দেওয়ার জন্যই সবকিছু প্রস্তুত করে রেখেছে। আমাদের কাজ হলো, সেগুলো বুঝে বুঝে সমাজের কাজে লাগান। বেদজ্ঞরা সেই চেষ্টাই করেছিলেন। আর সেই যুগের সমাজপতিরা সেই নীতিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। তাই তখন কোন অভাব ছিলনা। আমি চাই—আবার সেই বেদের যুগের মত প্রকৃতির নীতিতে সমাজ গড়ে উঠুক।

* * *

আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এই পুণ্যদিন সকলে একত্রে অঙ্গীকার কর—ভারতকে আবার বেদের সাম্যবাদের নীতিতে গড়ে তুলতে সকলে শাস্ত্রকেই অস্ত্ররূপে ধারণ করবে।

‘ছাই’ দিয়ে কি আগুন চাপা যায়?

—ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী

প্র(ঃ কিছুদিন পূর্বে টোকিও থেকে নেতাজীর ‘ভস্ম’ আনার ব্যবস্থা চলছিল,—প্রধানমন্ত্রী আবার সে চেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছেন। চেষ্টাই বা হলো কেন, বন্ধই বা হলো কেন? এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?

উত্তর ঃ ভস্ম দিয়ে অনেক চিন্তাই ভস্মীভূত করা যায়। নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা আজও দেশবাসীর মনে যতটা তীব্রভাবে জেগে আছে, তাতে অনেকেরই হয়তো কাজে অসুবিধা হচ্ছে। তাই সে চিন্তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর ভস্ম আনার ব্যবস্থা চলছিল কিনা কে জানে!

প্র(ঃ তবে আবার বন্ধ করলে কেন? এনেই দেখতো একবার—কি রকম প্রতিত্রি(য়াটা হয়?

উত্তর ঃ প্রতিত্রি(য়ার কথা চিন্তা করেই হয়তো এটা বন্ধ করা হয়েছে। নেতাজী যে বেঁচে আছেন, এটা তো সত্য। যাঁরা ভস্ম আনার চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে তো ঠিকই জানেন—নেতাজী জীবিত। দশচত্রে(ভগবানও ভূত হয়। সুভাষ বোসকে মৃত প্রমাণিত করা এমন আর শক্ত(কাজ কি? তাই হয়তো ভস্ম আনা হচ্ছিল। তাছাড়া মুখে যাই বলুক, জীবিত লোকের ভস্ম দেখানটা হয়তো ভারতীয় সংস্কারে লাগতে পারে—তাই বন্ধ করেছে।

ভারতে এখনও এমন অনেক ব্যক্তি(আছেন যাঁরা জনগণের মনে সুভাষ বোসের প্রভাব সহ্য করতে পারছে না। সে প্রভাব কিভাবে দূর করা যায়, তার জন্য অনেক বুদ্ধিদাতাও আছেন। কি প্রয়োগ করলে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়া যায়—‘সুভাষ নেই’, তার বহু চেষ্টাই চলছিল, এখনও চলছে। কি করলে মানুষের মনে নেতাজীর যে আদর্শের ছবি গেঁথে আছে তাকে নিশ্চিহ্ন(করে দেওয়া যায়, কিভাবে নেতাজীকে ভারতের জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তার চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়, তার চেষ্টাও কম হয়নি। এই তো কিছুদিন আগেও নেতাজীর মাথায় একটা শিং আর পেছনে একটা লেজ লাগানোর চেষ্টা চলছিল।

প্র(ঃ শিং আর লেজের কথা কি বললেন—ওটাতো ঠিক বুঝলাম না!

উত্তর ঃ ‘এমিলি’ আর ‘অনিতা’র কথাই বলছি। যিনি ভারতের জনগণের মনে চিরস্থায়ী নেতার আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁকে সেই আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনার জন্য তাঁর বিবাহের কথা প্রচার করা হলো। তাতেও যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো না, তখন ‘অনিতা’কে নিয়ে কি হৈ চৈ-টাই না করা হলো! সারা ভারতে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখান হলো—‘এই দেখো তোমাদের নেতাজীর কন্যা।’ আমার কাছেও এসেছিল সে, অর্থাৎ পাঠান হয়েছিল তাকে। তাকে দেখেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম—শুনেছি, হিটলারেরও নাকি এমন একটি কন্যা আছে বলে প্রচার করা হয়েছে? এ কথা শোনার সঙ্গে দেখলাম তার মুখ কালো হয়ে গেল। অন্যান্য আলাপ-আলোচনা ও আতিথেয়তার পর আমি তাকে বললাম,—তুমি বিদেশিনী, আমার কাছে এসেছো, আমি খুব খুশী হয়েছি। তার জন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা তোমায় জানাই—আমরা যে সুভাষকে জানি, তিনি অবিবাহিত। সুতরাং তোমাকে বিদেশী অতিথি হিসাবেই গ্রহণ করলাম, নেতাজীর কন্যা হিসাবে নয়। একথা শুনে ‘অনিতা’র মনে কি reaction হলো জানি না, কিন্তু তখনই সে অসুস্থতার ছুতো করে চলে যেতে চাইল।

এরপর আবার শু(হলো নেতাজীর ‘স্ট্যাচু’ তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করা, তাঁকে মৃত বলে প্রচার করার আর একটা পথ। যাদের সে স্ট্যাচু তৈরী করতে দেওয়া হয়েছিল, তাদের হয়তো হাত কেঁপেছিল জীবিত ব্যক্তি(র স্ট্যাচু তৈরী করতে গিয়ে। তাই শিব গড়তে বানর গড়েছে। দুটো যে মূর্তি দাঁড় করিয়ে রেখেছে দুই জায়গায়, তাকালেই মনে হয়—ভীমভবানী দাঁড়িয়ে আছে।

এরকম কতভাবেই যে নেতাজীকে অপমান আর মৃত বলে প্রমাণ করার তাল চলছিল তা সকলেই জানে। শেষ পর্যন্ত আর কিছু না পেয়ে ‘চিতাভস্ম’ আনার প্রচেষ্টা চলেছিল। ওটাও ভাল পন্থা। ভস্মটা যে নেতাজীর নয়—তাতো সূক্ষ্ম যন্ত্রেও ধরা পড়বে না। সুতরাং তাকে মৃত প্রমাণ করার এটাই সুবিধার পথ। তাছাড়া জনগণকে বুঝ দিলেই হবে যে, দেশের খাদ্যাভাবটা দূর করার জন্যই নেতাজীর ভস্ম আনা হয়েছে। বাংলা দেশের আজ চালের বড় অভাব, নেতাজীর ভস্ম মাটিতে ছড়িয়ে দিলেই ধান হয়ে ফুটে উঠবে। জহরলালের চিতাভস্ম তো আকাশ থেকে ভারতের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুনেছি, যেসব জায়গায় সে ছাই পড়েছে, সে সব দেশে নাকি গম বেশী হয়েছে। গমের দেশের লোকের ভস্মে যখন গম হয়েছে, তখন চালের দেশের লোকের ভস্মে ধান হবে—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। কর্তৃপ(হয়তো মনে করেছেন, বাংলা দেশে যখন খাদ্যসমস্যা একটা বিরাট সমস্যা, আর বাঙালী যখন (ুধায় (িপ্ত হয়ে গেছে, তখন ধানের লোভেই তারা নেতাজীর ভস্মকে accept করে (মেনে) নেবে।

কতরকম হাস্যকর প্রচেষ্টাই যে হলো! তদন্তের পর তদন্ত, কমিটির পর কমিটি—সবশেষে ভস্মে গিয়ে দাঁড়াল। সব কিছু ভস্মে গিয়েই দাঁড়াবে। কত আর ছাইচাপা দেবে? ‘ছাই’ দিয়ে কি আর আগুন চাপা দেওয়া যায়? তার তাপ ভস্মস্তূপ ভেদ করে যখন এদের গায়ে এসে লাগবে, তখন এরাও একটা অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে সব কিছু ভস্ম করে দিতে পারবে। ভস্ম তৈরী করতে এরাও জানে। নকল ভস্ম নয়, আসল ভস্মই। সে শক্তি(ও (মতা এদের যথেষ্টই আছে।

হিন্দু-মুসলমান রায়টের সময় হিন্দুপাড়ার অনেক মুসলমান নামাবলী গায়ে দিয়ে, আর মুসলমান পাড়ার অনেক হিন্দু লুঙ্গি পরে পালাতে গিয়েছে। মাথায় যেই একটা লাঠির বাড়ি পড়েছে, তখনই বৈষ(ব ঠাকুর ‘ইয়া আল্লা’ আর মোল্লা সাহেব ‘হায় ভগবান’ বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। যতই লুকোতে যাও, সত্য যা তা বেরিয়ে পড়বেই। নেতাজীর বেলাতেও তাই। যতই ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে, ততই সত্য

প্রকট হয়ে উঠছে। যতবার 'নাই' বলা হয়েছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে 'আছে'-টাই বেরিয়ে যাচ্ছে। কতবার 'নাই' বলা হলো, কতবার কমিটি তৈরী হলো! 'ছাই' আনার কথা হলো, পর(ণে আবার ছাইচাপা দিয়ে নূতন করে তদন্ত শু(হলো। তোমরা যদি জেনে থাক—ওটা তাঁরই চিতাভস্ম, তবে আবার তদন্ত কমিটির প্র(ওঠে কেন?

এখন আবার বাহিনীর পর বাহিনী পাঠান হচ্ছে। বর্ডারে তো বটেই, ভেতরেও সৈন্যসামন্তে ছেয়ে গেছে। কারণ কি?—না, দেশের অরাজকতা দমন করে বর্তমান পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনা। সত্যিই কি এই একটাই কারণ? না একঢিলে দুই পাখী মারার ব্যবস্থা হচ্ছে? এরপর তো শুনছি আবার মিলিটারীও আসবে। কিসের জন্য যে আজ বাহিনীর পর বাহিনীতে দেশ ছেয়ে ফেলা হচ্ছে, তা আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাবে। অযথা কথা বলে তো লাভ নেই। তবে একটা কথা বলে রাখি—তাঁরও বিরাট বাহিনী আছে। তাঁরাও প্রস্তুত হচ্ছে।

প্র(ঃ কোথায় তিনি আছেন—ঠিকানা বলতে কি অসুবিধা আছে?

উত্তর ঃ অসুবিধা কিছুই নেই। এত কাছে আছেন যে উঁকি দিলে দেখা যায়। সত্যিই যদি ঠিকানা জানতে চাও, ঘুরে এসোনা একবার নাগারাজ্যে। নাগারা নেতাজীর খুব অনুগত। তাঁর সব খবরই তারা রাখে। সেখানেই তাঁর সব খবর জানতে পারবে। পথের উপর পায়ের ছাপ ধরে ধরে যেমন হারিয়ে যাওয়া লোকের হদিস পাওয়া যায়, তেমনি সেখানে ঘরে ঘরে নেতাজীর এত চিহ্(আছে যে, সে চিহ্(ধরে এগিয়ে গেলে যে কোন অন্ধও তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারবে—ঠিকানা পেতে অসুবিধা হবে না।

ঠিকানা জানাতে আমার ব্যক্তি(গত কোন অসুবিধাই নেই। ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি বল! তবে আমায় অনেক রকম লোক নিয়ে চলতে হয় তো! তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করেই আমায় অনেক সময় নীরব থেকে সত্য গোপন করতে হয়। তাইবলে আজ 'আছে' বলে দুদিন পরে, জীবিত জেনেও, 'নাই' বলব না। সত্য বলতে না পারি, নীরব থাকব—মিথ্যা বলব না।

১৯৬০-এ একবার নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার জন্যই আমি দিল্লীতে জহরলাল নেহে(, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদির সঙ্গে সা(াৎ করতে গেছিলাম। শাহ্নওয়াজ তখন রেলওয়ে-মিনিষ্টার ছিলেন। তাঁরই বাড়ীতে আমি বেশ কিছুদিন ছিলাম। তিনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। যখন সেখানে ছিলাম, তখন বহুদিন তাঁর সঙ্গে নেতাজীর প্রসঙ্গে ঘরোয়াভাবে আমার আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। নেতাজীর ব্যবহৃত বহু জিনিস তিনি আমায় দেখিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বললাম—আমার মনে হয় নেতাজী জীবিত। তারপর এ ব্যাপারে আমার সাথে তাঁর অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।—পরে সময়মত সব জানাব।

দিল্লীতে যখন শাহ্নওয়াজের কাছে ছিলাম, তখন জওহরলাল নেহে(, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আমাকে তাঁদের কুঠিতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দিনে, আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল নেতাজী-প্রসঙ্গ। তাঁদের কথাবার্তায় আমি বুঝেছিলাম যে, তাঁরা ভালভাবেই জানেন—নেতাজী জীবিত এবং এশিয়ার কোথাও না কোথাও আছেন। সে নিয়েও তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কথাবার্তা হয়। সে সব কথা পরে সময় হলে জানাবার ইচ্ছা আছে।

আমি নেতাজীকে ফিরিয়ে আনতে চাই জেনে সেই সময় শাহ্নওয়াজের বাড়ীতেই নেভি থেকে ও মিলিটারী থেকে কত বিশিষ্ট ব্যক্তি(ও অফিসার আমার সঙ্গে সা(াৎ করেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেও জানলাম—তাঁরা নেতাজী সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত আছেন। তাঁরাও নেতাজীকে ফিরিয়ে আনতে চান।

এরপর আমি কলকাতায় ফিরে এসে আমার N.S.S. বাহিনী নিয়ে কাজে নামলাম। চলে গেলাম নর্থ বেঙ্গলে। ডাঃ বিধান রায় তখন আমাকে এবিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এ কার্যে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন হতো। তিনি নেতাজীরই এক ভাগিনেয়কে (S.P.) নর্থ বেঙ্গলে ট্রান্সফার করে দিলেন। আমাকে খবর পাঠালেন—যা কিছু করার, তার সঙ্গে যোগাযোগ করেই যেন করি। আমি তখন শৌলমারীর ফালাকাটাতে।

নেতাজী ভারতে ফিরে এলে তাঁকে কি অবস্থায় পড়তে হবে, এটা পরী(া করার জন্যই হয়তো নেতাজীরই পরিকল্পনা অনুযায়ী সে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আশ্রমের সাধু সারদানন্দজী নেতাজী নন ঠিকই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে নেতাজীর যোগাযোগ তো ছিল। কর্তৃপ(যদি সত্যই নেতাজীকে চাইতেন, তবে সাধুজীকে একবার জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করতে পারতেন। তাদের সামনেই তাঁকে প্র(করতে পারতেন—তিনি নেতাজী কি না, কিম্বা নেতাজী সম্বন্ধে তাঁর কিছু জানা আছে কি না। তা না করে নানা ভাবে তাঁকে আটকাতে চেষ্টা করা হয়েছিল—এটা তো সত্যি। সাধুজীকে নেতাজী মনে করে সেই আশ্রমে যে ঝড় বয়েছিল, আসল নেতাজী ফিরে এলে তাঁকে যে কি দুর্ভোগ পেতে হবে, আর দেশে যে কি ভয়ঙ্কর তুফান উঠবে, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। শৌলমারী আশ্রম থেকে এটাই তারা বুঝে গেল—জনগণ নেতাজীকে ঠিকই চায়, কিন্তু কর্তৃপ(র চাওয়ার মধ্যে ফাঁক আছে। সুতরাং নেতাজীর আসা এখন বিপজ্জনক। একথা বুঝেই সাধুজী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেলেন।

ডাঃ রায় কিন্তু মনেপ্রাণে চাইতেন—নেতাজী ফিরে এসে দেশের হাল ধ(ক। তাই তিনি আমায় সব দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সাহায্যেই আমি শৌলমারীর সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে নর্থ বেঙ্গল পরিভ্রমণ করে সবকিছু ব্যবস্থা ঠিক করে যখন কলকাতায় ফিরে আসছি, তখন দার্জিলিংএ খবর পেলাম, ডাঃ রায় মারা গেছেন। আমার দুর্ভাগ্য, বাংলা তথা সমগ্র ভারতের দুর্ভাগ্য—নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার কাজে একটা চরম বাধা পড়ল।

এরপর প্রফুল্ল সেন মুখ্যমন্ত্রী হলেন। সুতরাং আমাকে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হলো। একদিন এপয়েন্টমেন্ট করে তাঁকে আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হলো। তিনি আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেদিন N.S.S.-বাহিনী দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ডিফেন্স পার্টির জন্য তাঁর হাতে বেশ কিছু টাকা তুলে দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হলো। সেইভাবে কার্ডও ছাপান হলো। আমরা প্রতী(া করে রইলাম।—মুখ্যমন্ত্রী এলেন না, কিছু জানালেনও না। পরে খবর পেয়েছিলাম, তিনি নাকি শুনেছেন N.S.S. কথার অর্থ 'নেতাজী সুভাষ স্কোয়াড'—এদের উদ্দেশ্য

হলো নেতাজীকে ফিরিয়ে আনা, আর তারই জন্য তারা মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য কামনায় তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইছে। এই কারণেই নাকি তিনি এনগেজমেণ্ট বাতিল করেছেন। সেটা একবার তিনি জানাবারও প্রয়োজন মনে করেন নি। যাই হোক, তারপর থেকেই আমি ল(্য করেছি, আমার কাজে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে, আমি তাঁর রোষদৃষ্টিতে পড়েছি। আমারও রোখ চাপল—যাকে আমরা নেতাজী বলে মনে করছি, যেভাবেই হোক তাকে একবার নিয়ে আসার চেষ্টা করি (জনগণের জিজ্ঞাসার সমাধান হোক। তাই শত বাধা সত্ত্বেও আমি আমার N.S.S. বাহিনী নিয়ে কাজে নামলাম। শুধু যে বাধাই পেয়েছি তা নয়, ভেতরে ভেতরে অনেকের সাহায্যও পেয়েছি। অনেকেই আমার কাছে তখন এসেছিলেন। জেনারেল কারিয়াপ্পা, মেজর সত্য গুপ্ত, হেমন্ত বোস, উত্তমচাঁদ মালহোত্র, নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, গোপ গু(বক্স, বি(েজিৎ দত্ত ইত্যাদি। তাছাড়া I.N.A.-র বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি(এবং নেতাজী-পরিবারের অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁরা কেউ নেতাজী সম্বন্ধে জানতে এসেছিলেন, কেউ এবিষয়ে সাহায্য করতেও এসেছিলেন। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে দেশপ্রিয় পার্কের একটা জনসভায় যেদিন খোলাখুলিভাবে আমার ইচ্ছার কথা জানালাম, তার দু'দিন পরে সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি, পুলিশে পুলিশে বাড়ি ঘেরাও। তার পরের ঘটনা সকলেই জানে। সারদানন্দজীর উপর যে কেস আরোপ করতে চেয়েছিল—পারেনি, আমার উপর দিয়ে তার জের চলল। জান তো, হাতীর মাথায় গাছ ভেঙ্গে পড়লেও তার কিছু হয়না, কিন্তু পায়ের তলে ছোট্ট একটা কুলের বীচি পড়লেই তার গতি আটকে যায়। আমাকে বাধ্য হয়ে থামতে হলো। সেই কুলের বীচি এখনও পায়ে আটকে আছে। কতদিনে যে চলতে পারব জানিনা। এখন তোমরা যদি পার, তাঁকে আনতে চেষ্টা কর। শুধু ঠিকানা কেন, আমি সবকিছু দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবো। তিনি এখনও active আছেন। আগেও বলেছি, এখনও বলছি—এক হাতে রাশিয়া অপর হাতে চীন-এর হাত ধরে তিনি ভারতের সঙ্গে মিলাতে চাইছেন। কূপ খনন করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বিরাট নদীর মত খাল কাটতে চাইছেন—যাতে তিন দেশ একত্রে অবগাহন করতে পারে।

এখন এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। কথা উঠলেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়ে—আমার কাজের অসুবিধা হয়। পরে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার ইচ্ছা আছে।

* * *

শয়তানির কারখানাগুলো লক-আউট কর, পিকেটিং কর সেখানে

প্র(ঃ কতদিন যাবৎ ভাবছি আপনাকে একটা কথা জানাব এবং সে সম্বন্ধে আপনার মতামত নেবো। আমি রাজনীতিতে খুব আগ্রহী। রাজনীতির (ে ত্রে নামব কিনা, নামলে কোন্ পার্টিতে যোগ দেব এবং কিভাবে কাজ করব সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন। আপনার মতামতের উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

উত্তর ঃ সত্যিই রাজনীতি (ে ত্রে নামতে চাও?

প্র(ঃ হ্যাঁ।

উত্তর ঃ এখনকার রাজনীতি করতে হলে তো আগে হাতেখড়ি হওয়া দরকার। তোমরা কয় ভাইবোন?

প্র(ঃ পাঁচ ভাই, এক বোন।

উত্তর ঃ তবে এক কাজ কর, বাড়ী গিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে আগে খুব করে ঝগড়া কর, মারামারি কর। বাপ-মাকে না খাইয়ে রাখার চেষ্টা কর। যারা তোমার উপর নির্ভরশীল, তাদের আশা-আকাঙ(া, ছোটখাট স্নেহের দাবীগুলোকে যেমন করে পার দমন কর। এসব কাজে যদি অভ্যস্ত হতে পার, এভাবে যদি মন তৈরী করতে পার, তবেই এখনকার রাজনীতি করতে স(ম হবে।

প্র(ঃ আপনি একি বলছেন? রাজনীতি করতে গেলে ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে, মা-বাবাকে ভুখা রাখতে হবে? এটা কি আপনার আদেশ না উপদেশ?

উত্তর ঃ এটা আমার আদেশও নয়, উপদেশও নয় (এটা হলো বর্তমান যুগের নির্দেশ। তোমার রাজনীতি করার সখ হয়েছে তো, তাই আজকাল রাজনীতির নামে বেশীর ভাগ (ে ত্রে যা চলছে, সেই কথাই তোমায় জানালাম। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বিবাদ করতে না পারলে বর্তমানের রাজনীতি করতেই পারবে না। তাই তোমায় সেটা আগে তোমার নিজের পরিবার থেকে শিখে আসতে বললাম। মনে রেখো, রাজনীতির (ে ত্র আর পারিবারিক (ে ত্র আলাদা কিছু নয়। প্রথমটা দ্বিতীয়রই একটা এনলার্জড্ এডিশন (বৃহত্তর সংস্করণ)। পরিবারের বিভিন্ন সভ্যদের সঙ্গে যেভাবে চলতে হয়, যেভাবে আচার আচরণ করতে হয়, রাজনীতির বৃহত্তর (ে ত্রেও সেইভাবেই চলতে হয়, সমাজের সকল সভ্যের সঙ্গে সেইভাবেই মিশতে হয়—এটাই বেদের কথা। এটাই আমি জানি।

আজকাল রাজনীতিতে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটিটাই যদি মুখ্য হয়ে ওঠে, সমাজকে না খাইয়ে রাখাটাই যদি প্রধান হয়ে ওঠে, তবে তার (ুদ্র সংস্করণ পরিবারের মধ্যেও সেগুলো আমদানি করতে হবে বৈকি। তাই বলছিলাম, নিজের ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়া করে আগে ট্রেনিং নিয়ে যাও। জান তো, বক্সারদের কাছে যদি কেউ ট্রেনিং নিতে যায়, প্রথম দিনেই, কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ নাকের উপর একটা বেদম ঘুসি দিয়ে বসে। দরদর করে রক্ত(পড়তে দেখে সে কি হলো বুঝতে না বুঝতেই আর একটা ঘুসিতে নাকের হাড়টাই দেয় ভেঙ্গে। ওস্তাদকে যদি তখন জিজ্ঞাসা করা যায়, না জানিয়ে নাকে ঘুসি দিলেন কেন, তখন সে বলবে—বক্সিং যখন লড়বে, তখন তো প্রতিপ(তোমাকে আগে থেকে নোটিশ দিয়ে ঘুসি দেবে না! হঠাৎই দেবে। বক্সিংএর (ে ত্রে নামলে নাকটা তো যাবেই, তাই আগে থেকে ভেঙ্গে দিলাম। তাছাড়া সাকরেদ

হিসাবে তুমি গ্রহণযোগ্য কিনা, প্রকৃত বক্সার হতে পারবে কিনা তারও একটা পরী(া হয়ে গেল। বক্সিং যদি করতে চাও, তবে এ ঘুসি তোমাকে সহ্য করতেই হবে।

আজকের রাজনীতি তো একরকম ঘুসোঘুসিই। ভাই-বোনদের সঙ্গে যদি ঘুসোঘুসি করতে না পার, তবে বর্তমান রাজনীতির (ে ত্রে নামার যোগ্য বলে বিবেচিতই হবে না।

প্র(ঃ বর্তমান রাজনীতি কি শুধুই ঘুসোঘুসি?

উত্তর ঃ তাছাড়া আর কি বল? হয় ঘুস, না হয় ঘুসি। এইতো চলেছে আজকাল। অবশ্য এ অভিজ্ঞতা আমার আগে ছিল না। রাজনীতির এই রূপ আমি কখনও চিন্তা করিনি। আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যুক্ত(ফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে।

যুক্ত(ফ্রন্টের আমলে চোদ্দপার্টি ছিল যেন এক মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভাই। যাতে যুক্ত(ফ্রন্ট শাসন হাতে পায়, তার জন্য আমি বহু চেষ্টা করেছি। চাল অগ্নিমূল্য, তবুও আমি অনেককে বলেছি—একটু কষ্ট স্বীকার করে থাক। সোনা, গহনা, ঘটিবাটি বিত্র(ী করেও কয়েকটা দিন চালিয়ে নাও। যুক্ত(ফ্রন্ট এলে আর দুঃখ থাকবে না। আমি তাদের আ(াস দিয়েছি। এ আ(াস যুক্ত(ফ্রন্টও আমাদের দিয়েছিল। একথা বি(াস করে ল(ল(লোক আবার তাদের ভোট দিল, নির্বাচন করল। কিন্তু তারা কি করল?—নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি মারামারি করে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ আনল তো! যুক্ত(কে বিযুক্ত(করল তো! আমরা এখন মুখটা দেখাই কি করে? পাওনাদারের কাছ থেকে হাওলাৎকারীদের মত ছাতার আড়াল করে লুকিয়ে লুকিয়ে পালাতে হচ্ছে। আজকের যে পরিস্থিতি, সে তো গৃহবিবাদেরই ফল। রাজনীতির নামে কি হচ্ছে আজকাল তাকিয়ে দেখ। যে যাকে পারছে তার মাথায় লাঠি মারছে, আবার সুযোগ বুঝে কাঁঠালও ভাঙ্গছে। যুক্ত(ফ্রন্ট যখন নির্বাচিত হলো, তখন শঙ্খধ্বনি হয়েছিল। আর আজ? ধ্বনি ঠিকই হচ্ছে—শুধু বোম আর বুলেটের। এতো ভাইয়ে ভাইয়ে ঘুসোঘুসিরই ফল।

বেদের যুগে মুঠো করে ধূলো ধরলে তা সোনা হয়ে ফিরে আসত। আর আজ! সোনা ধর, মুঠো খুলে দেখবে তা ধূলো ছাড়া আর কিছু নয়। যেখানে তাকাবে সেখানে দুর্নীতি, যেখানে হাত দেবে সেখানেই ভেজাল। এসব দেখেও তোমার রাজনীতি করার সখ জাগছে?

প্র(ঃ হ্যাঁ, এসব দেখেই রাজনীতি করতে ইচ্ছা করছে। আপনি বলে দিন, প্রকৃত রাজনীতির স্বরূপ কি। আমি না হয় সেইভাবেই কাজ করব।

উত্তর ঃ সকল নীতির সেরা নীতি হচ্ছে রাজনীতি। আজকাল রাজনীতির নামে যা হচ্ছে সেটা তো 'সাজ-নীতি'। আজকালকার ধারণা, একটা 'পার্টির পোষাক' গায়ে না চড়ালে রাজনীতি করা যায় না। অর্থাৎ রাজনীতি করতে হলেই আগে একটা দল চাই। তুমি বললে কিনা, কোন্ পার্টিতে যোগ দেবে,—তাই একথা বললাম। রাজনীতি করতে হলে আলাদা পোষাক পরিচ্ছদ পরতে হয় নাকি? তুমি কি পার্টিতে নাম লিখিয়ে বিশেষভাবে দেখাতে চাও—তুমি রাজনীতিতেই আছ? পার্টির পোষাক না পরলেও রাজনীতি করা যায়। প্রকৃত রাজনীতির (ে ত্র একটা বিশেষ (ে ত্রে সীমাবদ্ধ নয়। এর (ে ত্র অনেক বিরাট, অনেক ব্যাপক। সে (ে ত্রে সকলেই আছে—কেউ ফ্রন্টে থেকে কাজ করছে, কেউ পেছনে থেকে কাজ করছে। যে যা করছে, তাইই রাজনীতি। সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ বল, শি(ামূলক কাজ বল, সাংস্কৃতিক কাজ বল, এ সব কিছুই একটা কাজেরই বিভিন্ন দিক। রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, শি(ানীতি—এর কোনটাকেই আমরা একেবারে 'এয়ার-টাইট কম্পার্টমেন্টের' মত সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে দিতে পারি না, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সংযোগ আছে। সুতরাং যে যে-(ে ত্রেই কাজ করে যাক, প্রত্য(ভাবে বা পরো(ভাবে রাজনীতিতেই সহায়তা করছে।

সত্যি যদি তুমি রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে থাক, তবে বরং সকলের মনে রাজনীতির প্রকৃত অর্থকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা কর। বুঝিয়ে দাও—রাজনীতি শুধু ঘুষ আর ঘুসি নয়, মিটিং আর চিটিং নয়। এর অর্থ অনেক গভীর, এর সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। এটা যদি করতে পার, তবে সেটাও হবে একটা রাজনীতিরই কাজ।

প্র(ঃ এ কাজ করতে হলে আমায় কি করতে হবে?

উত্তর ঃ এখনও তো তোমার অল্প বয়স। আগে বাড়ীতে বসে বাংলার আর ভারতের যত দল আছে, তাদের সকলকার মূল উদ্দেশ্যগুলো খুঁজে বার কর। এদের মত, এদের পথ, কি এরা করতে চায়, কি তারা করছে, সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝ। দেখ, তারা জনগণকে যা বলছে কার্যতঃ তা করছে কিনা। কোন্ পার্টিতে নাম লেখাবে তার চিন্তা আগে না করে, পার্টির চিন্তাধারা ব্যাপক কিনা সেটা আগে বিচার করে দেখ। তারপর পার্টিতে নাম লেখাবে কিনা, নিজের মনের কাছেই তার জবাব পেয়ে যাবে। কিছু না বুঝে, না জেনে কা(র কথায় পার্টিতে নাম লেখালে চিন্তাধারা সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—আজকাল অনেক (ে ত্রেই যা হচ্ছে। দলভারি করার জন্য অনেকেই ভাল ভাল কথা জনগণকে বলে বেড়ায়, কাজের সময় তা করে না। আর যেটুকু করে, খোঁজ নিয়ে দেখ, পার্টির লোকেদের জন্যই করে। ভলাণ্টিয়ার্সরা করবে জনগণের সেবা। তা না করে তারা যদি তাদের নিজেদেরই সেবা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তো মুস্কিল। পার্টি থেকে কতটুকু সার্ভিস (কাজ) জনগণ পাচ্ছে? তাতে তাদের কতটুকু সুযোগ-সুবিধা হচ্ছে বল? তাই আমার মনে হয়, পার্টির মধ্যে থেকে নিজের চিন্তাধারাকে সঙ্কীর্ণ না করে, স্বাধীনভাবে সমাজসেবায়, দেশের কাজে, জনগণের হিতার্থে যদি নিজেকে উৎসর্গ করতে পার, তবে সেটাই হবে বড় রাজনীতি।

আজকের দিনে এইভাবে কেউ নিজেকে উৎসর্গ করতে পারছে না বলেই চারিদিকে একটা আগুন জ্বলার পূর্বাবস্থা দেখা দিয়েছে। প্রত্যেক পার্টিই জনগণকে শান্তির বাণী শোনাচ্ছে, বারি সি(ন করতে পারছে না। শুকনো কথার ঘর্ষণে শান্তিবর্ষণ হয় না, দাবানলই জ্বলে ওঠে। ভাল ভাল কথা শুনে অভিনন্দন জানাতে জানাতে তো গলা শুকিয়ে গেল, হাততালি দিতে দিতে তো হাতে কড় পড়ে গেল! লাভটা হলো কি? ভিটাতে যে আজ শকুন বসে আছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ না?

তুমি মনে করো না, কা(র প্রতি বা কোন দলের প্রতি ব্যক্তি(গত আত্রে(াশ থেকে আমি এসব কথা বলছি। এসব বলছি দুঃখ থেকে। রাজনীতির উদ্দেশ্য থাকবে দেশের শান্তি, দশের শান্তি। যত দল, যত পথ থাকুক না কেন, উদ্দেশ্য হবে এক। আর উদ্দেশ্য যখন এক, তখন মতভেদ আসবে কেন? বিবাদ হবে কেন? কিন্তু তাই হচ্ছে। তার কারণ আজ যে শান্তির কথা বলা হচ্ছে, সে শান্তি সবাইকে নিয়ে নয়। মুষ্টিমেয় ব্যক্তি(র শান্তি কামনাই আজকের বিভিন্ন দলের প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি(একচ্ছত্র আধিপত্য করছে, আর কয়েকজনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। একে কি রাজনীতি বলে?

তুমি যদি রাজনীতি করতে চাও, তবে আগে নিজের মনকে ব্যাপক

কর। সবাইকে আপন মনে করে এক আসনে আনতে চেষ্টা কর। বি(্ববোধ যত(ণ পর্যন্ত না জাগবে, তত(ণ পর্যন্ত রাজনীতি করার অধিকারী তুমি নও।

প্র(্ন ঃ এরকম মন ও ইচ্ছা কি কোন পার্টির কোন মেম্বার-এর মধ্যেই নেই?

উত্তর ঃ পার্টির নাম না করাই ভাল। কোন কোন পার্টিতে যে একেবারেই নেই, তা নয়। তাদের নীতিতে ও আদর্শে আছে, কিন্তু কার্যে ততটা নেই। চিন্তায় ভাবনায় আছে, আচার-আচরণে তেমন পাওয়া যায় না। কি লাভ বল এতে? ব্যক্তি(গতভাবে যদি কোন পার্টির মেম্বারের কথা জিজ্ঞাসা কর, তবে বলব, তাদের অনেকেই সত্যিই মনেপ্রাণে আদর্শবাদী, তারা দেশের জন্য সত্যিই প্রাণ দিয়ে অনেক কাজ করেছে, এখনও করতে চায়। দেশের দরিদ্র কৃষক, মজুর, শ্রমিকদের জন্য এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু পরগাছাদের প্রভাবে অনেক সময়ই কিছু করতে পারে না।

আজকাল অনেক (ে ত্রে শোষক ও পুঁজিবাদীদের প্রভাবে পার্টিকে নড়াচড়া করতে হচ্ছে। যেহেতু পার্টির মেম্বার, সেইহেতু তাকে পার্টির ডিসিসন মেনে নিতেই হবে, সেইজন্য মেম্বারদের অনেক সময় ব্যক্তি(গত ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ত্যাগ করতে হয়। ফলে অনেক (ে ত্রেই তারা ত্র(মশঃ আদর্শ থেকে চ্যুত হয়ে পড়ছে। সত্যিকারের মন থেকে সরে পড়ছে।

এই যে আজকাল অনেক সময় পুঁজিবাদীদের নির্দেশে পার্টিকে নড়াচড়া করতে হচ্ছে, তারজন্য অবশ্য আমি সবসময় পার্টিকে দোষ দিই না। কারণ শোষক ও পুঁজিবাদীদের প্রভাব আজ সমাজে এত বেশী যে, এ প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত(করা খুবই কঠিন কাজ। অবশ্য কেউ যে এ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছে না, তা নয়। যারা তা পারছে, তারাই রাজনীতি করার যোগ্য।

প্র(্ন ঃ আচ্ছা, পুঁজিবাদীদের প্রভাবে অনেক সময় পার্টিকে নড়াচড়া করতে হয়—একথা আপনি কেন বললেন?

উত্তর ঃ পার্টি চালাতে হলেই অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ আসবে কোথা থেকে? হয় ভি(া করতে হবে (ভি(া আজকাল কেউ দিতে চায় না, কারণ প্রত্যেকেরই নিজের অভাব পূরণ হচ্ছে না), তা না হলে ডাকাতি করতে হবে। তখন আইনের ভয় আছে। এছাড়া আর একটি পথ আছে—পুঁজিবাদীদের মন জুগিয়ে চলা। সেটা অপে(াকৃত সহজ পথ। হয়তো কেউ সেই সহজ পথের দিকে ঝুঁকলো, অন্যেরা এপথ সহজ হলেও আদর্শবিরোধী বলে বাধা দিতে চাইল।—বেধে গেল পার্টির ভেতরে গণ্ডগোল। আবার অনেক সময় পার্টি হয়তো নিজেদের মধ্যে মিটিং করে ঠিক করে নিল—এই পুঁজিবাদীদের থেকেই টাকা নেওয়া উচিত (সে টাকা নিয়ে সমাজ-সেবায় লাগালে ভাল ছাড়া মন্দ হবে না। এই সিদ্ধান্ত করে তারা পুঁজিবাদীদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করল। একথা জানতে পেরে 'পুঁজিবাদীদের দালাল' বলে অন্য পার্টি আবার লাগল তাদের পেছনে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় রাজনীতির ডামাডোল। নিরীহ জনগণকেই তার ফল ভোগ করতে হয়।

সমাজকে দূষিত করার মূলেই এই শোষকশ্রেণী। এরা সমাজের পরগাছা। সমাজকে শোষণ করার (মতা এদের প্রবল। সুতরাং প্রকৃত রাজনীতি যদি করতে চাও, শোষণ ও পুঁজিবাদকে বিনাশ কর। বেদও সেই নির্দেশই দিয়েছে—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।' দুষ্কৃতিকে বিনাশ করতে হলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করলে চলবে না, ভাইয়ের জন্য বড়াই কর। এতগুলো ভাই একত্রে মিলিত হলে, সে শক্তি(কত প্রবল হবে ভাবতো! শয়তানের (মতা যত প্রবলই হোক, এই মিলিত শক্তি(র প্রবলতার কাছে টিকতে পারবে না। তাই ভাইয়ের মাথায় লাঠি মেরে শক্তি((য় না করে, ভাইয়ের হাতে লাঠি তুলে দাও। সবাই মিলে একত্রে অভিযান কর শয়তান আর শয়তানির বি(দ্ধে। খোঁজ করে দেখ, কোথায় কোথায় চলেছে শয়তানির কারখানা। সেই কারখানাগুলো 'লক-আউট' কর—পিকেটিং কর সেখানে।

সমাজকে বাঁচাতে হলে মূলসমেত তুলে ফেল পরগাছাদের। (তি করার (মতা এদের অসীম। মূল গাছকে দিয়ে জল, আলো, হাওয়া সবকিছু সংগ্রহ করাবে, তারপর গাছের শরীর থেকে সেটা শুষে নিয়ে নিজের পুষ্টি সাধন করবে। —এমনি শয়তান! গাছকে তো বাড়তে দেয়ই না(যে মাটি বা দেওয়াল অবলম্বন করে তারা ওঠে, তার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে শিকড় বিস্তার করে যে, সমস্ত রসটুকু নিঙড়ে নিয়ে তাকে বিচূর্ণ করে ফেলে—অসার করে দেয়। অথচ কেউ তাদের কার্যকলাপ টের পায় না!—এই হলো পরগাছার শক্তি(। অল(্যে থেকে তার জাল বিস্তার করে চলেছে।

সমাজ আজ এমনি পরগাছায় ছেয়ে গেছে। তুমি যদি রাজনীতি করতে চাও, আগে পরগাছাগুলোকে চেনো। দেখ, সমাজের কোথায় তারা শিকড়ের জাল বিছিয়েছে। তাদের একটা লিষ্ট তৈরী কর। কোথায় কার গলতি আছে, কে কিভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করছে দেখ এবং সেইভাবে তোমার কর্মের গতি স্থির কর। এদের সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তা না হলে সে বিষবৃ(সমাজ ছেয়ে যাবে। তখন সে শক্তি(কে রোধ করা খুব কঠিন হয়ে পড়বে।

পুঁজিবাদীরা যেমন সমাজের পরগাছা, আমাদের দেশের তথাকথিত 'ধর্মবীরেরা'ও তেমনি পরগাছা। ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে শোষণ করে চলেছে। ধর্ম সম্বন্ধে এমন বোঝান বুঝিয়েছে যে, আজ 'ধর্ম' এই কথাটা শুনলেই সকলের এলার্জী হয়। দোষ তো ধর্মের নয়, দোষ হচ্ছে ধর্মের স্বচ্ছ ধারার মধ্যে ভেজালের বিষ যারা মেশাচ্ছে তাদের, যারা শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছে, রাহুর দশা, শনির দশা বলে, পাপ-পুণ্যের ভয় দেখিয়ে যাগ-যজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নামে অর্থ লুটে নিচ্ছে। আজ আমার সত্যিই লজ্জা করে 'সাধু-গু(' নাম নিতে। কারণ আজ তথাকথিত সাধু-গু(-মহানরা ধর্মের সত্যিকারের ব্যাখ্যা না দিয়ে জনসাধারণকে উল্টো বোঝাচ্ছে, আর সমাজকে দুর্বল করে ফেলছে। এরাও পরগাছা। এদেরও সমূলে বিনাশ করতে হবে। আমি নিজেই এ পথে থেকে এ কাজটা করে যাব। চুরমার করে দিয়ে যাব ধর্মের নামে ভেজালের কারখানাকে।

তোমরাও এ বুদ্ধি নিয়ে যদি সত্যিকারের এগিয়ে আসতে পার, তবে এসো। এটাও একটা রাজনীতিরই কাজ। তোমার স্বর্গও নেই, নরকও নেই। পাপ-পুণ্যের চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। জন্মেছ যখন, তখন মরতেই হবে। সেই জন্ম-মৃত্যুর মাঝের সময়টিতে যতটুকু কাজ করতে পারবে, করে চলে যাও। শুধু দেখো, ন্যায়ের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হও। বেদ বলছে—'যা সব কিছুকে ধারণ করে আছে তাহাই ধর্ম।' অর্থাৎ সত্যই ধর্ম। ধর্মই ন্যায়। ন্যায়ই রাজনীতি। অতএব রাজনীতির (ে ত্র হলো ন্যায়েরই (ে ত্র। সুতরাং রাজনীতি আর ধর্মনীতি আলাদা কিছু নয়। শুধু নামে আর রূপেই তফাৎ—বিষয়ে এক। একটি বরফ, আর একটি জল।